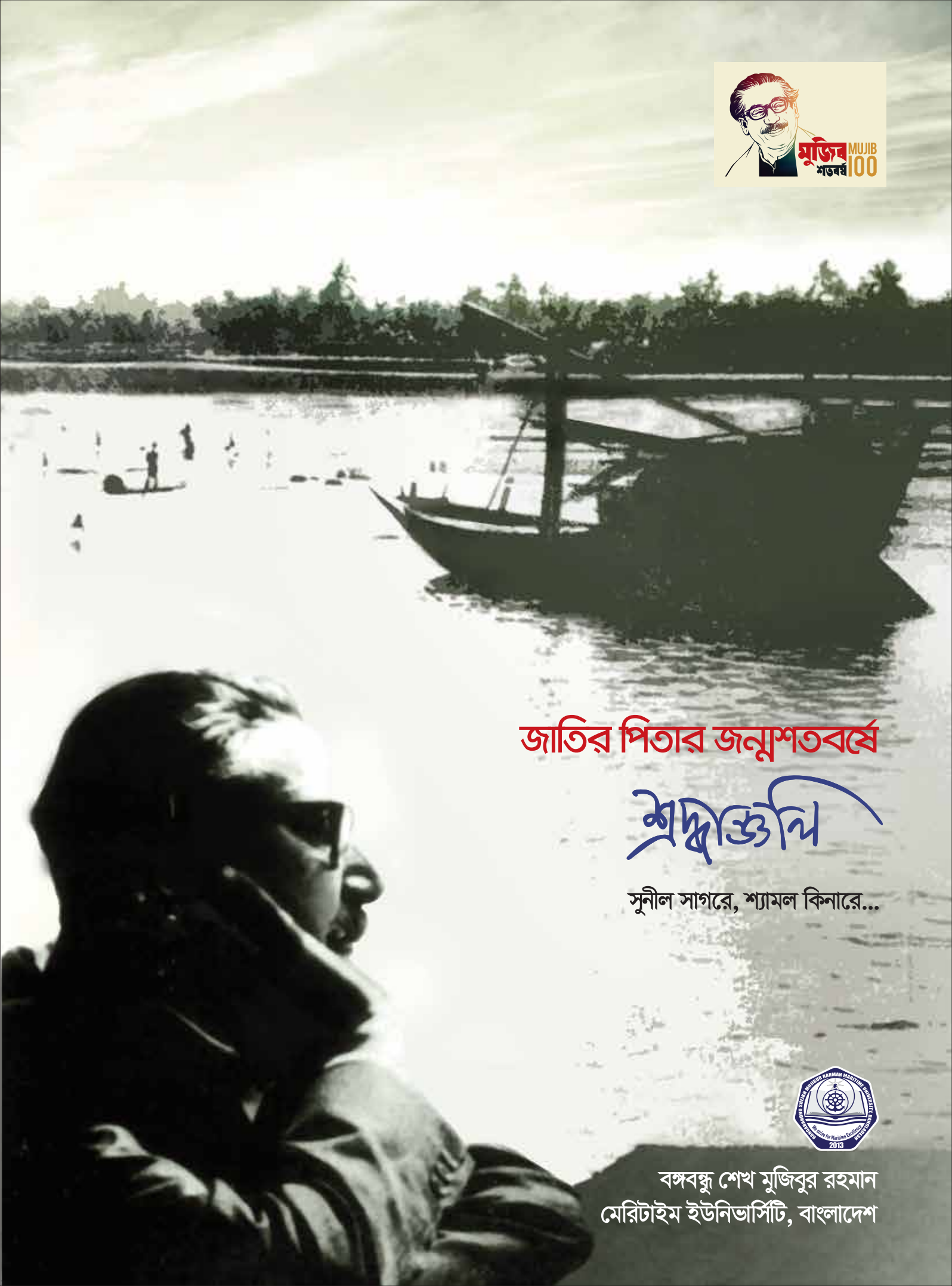

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুনীল সাগরে, শ্যামল কিনারে...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

উৎসর্গ

বাংলাদেশের মেরিটাইম ভিশনের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট' প্রবর্তনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মেরিটাইম বাংলাদেশের ভিত রচনা করে গেছেন। তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ২০১৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি , বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'মুজিববর্ষ ২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সাহসী পদক্ষেপ ও দূরদর্শী দিকনির্দেশনার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত 'জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি: সুনীল সাগরে, শ্যামল কিনারে...' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করা হলো।

জাতির পিতার
জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুনীল সাগরে, শ্যামল কিনারে...

প্রকাশকাল: ১৭ মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা পরিষদ

রিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল
বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি
উপাচার্য, বিএসএমআরএমইউ
প্রধান উপদেষ্টা

কমডোর এ এম কামরুল হক
(এনডি), এনজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন
ট্রেজারার
উপদেষ্টা

কমডোর এ জেড এম জালাল উদ্দিন
(সি), পিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি, বিএন
রেজিস্ট্রার
উপদেষ্টা

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন
একাডেমিক উপদেষ্টা

ক্যাপ্টেন আবু তাহের গোলাম মোহাম্মদ সরকার,
(ট্যাজ), পিএসসি, (অবঃ), বিএন
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

ড. মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা)

ড. ফেরদৌসী বেগম
সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন)

স্বর্ণা দত্ত
প্রভাষক (বাংলা)

আহাম্মদ করিম
সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর)

ডিজাইন ও প্রকাশনা

Wings of Wind

ছবি কৃতজ্ঞতা
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বিএসএমআরএমইউ
এনলাইটেন ভাইবস
ইন্টারনেট

মুখবন্ধ

আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য একটি বিশেষ দিন ১৭ মার্চ, ২০২০। এইদিন স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালকে 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। নানা আয়োজনে বছর জুড়ে স্মরণ করা হবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আয়োজনে শ্রদ্ধা জানাবে জাতির পিতাকে। তেমনই এক শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি: সুনীল সাগরে, শ্যামল কিনারে....'

বাংলাদেশের জন্য এক অপার সম্ভাবনা এর সমুদ্র সম্পদ তথা মেরিটাইম সেক্টর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অনেক আগেই এই সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। ১৯৬৬ এর 'ছয় দফা'য় পূর্ব বাংলায় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভাবনারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ পরিণত হয় সমুদ্র আইন প্রণয়নকারী প্রথম দিকের দেশগুলোর একটিতে। ১৯৭৪ সালে তিনি প্রণয়ন করেন সমুদ্রাঞ্চল বিষয়ক আইন 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট-১৯৭৪'।

বঙ্গবন্ধুই এদেশের সমুদ্র, নদ-নদী, নৌপথে এবং নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রথম পথপ্রদর্শক। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, সক্রিয় উদ্যোগ এবং প্রেরণায় যুদ্ধবিদ্ধস্ত নৌঅবকাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। পণ্য পরিবহণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সচল করতে রাশিয়ার সহযোগিতায় মাইন অপসারণ করে চট্টগ্রাম বন্দরের পুনরুদ্ধার কার্যক্রম হাতে নেন তিনি। নারায়ণগঞ্জের ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডে পাঁচটি প্যাট্রল ক্রাফট নির্মাণ করে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে দেশীয় প্রযুক্তির গোড়াপত্তন করেন। সেই জাহাজনির্মাণ শিল্প এখন বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পখাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ও মেরিন ফিসারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবন্ধু। সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্রসীমা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলতেও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়নে বিইডব্লিউটিসি প্রতিষ্ঠা, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠন, ভারত-বাংলাদেশ আন্তঃদেশীয় নৌপরিবহন ও বাণিজ্য প্রটোকল স্বাক্ষরও বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই সম্পন্ন হয়। এছাড়া মেরিটাইম ভিশনের স্থপতি জাতির পিতা সমুদ্র সম্পদের সরবরাহ, সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন নানামুখী উদ্যোগ। তাঁর নির্দেশিত পথ ধরেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ পূরণের মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধ ও টেকসই মেরিটাইম দেশে পরিণত হবে।

মেরিটাইম সেক্টরকে সমৃদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ। মেরিটাইম ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা একটি সমৃদ্ধ মেরিটাইম জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সবাইকে মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা।

রিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি
উপাচার্য
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

মুজিব শতবর্ষে বিএসএমআরএমইউ এর গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ

- টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন
- বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন
- সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা যাদুঘর ও শিখা চিরন্তন পরিদর্শন
- কুইজ প্রতিযোগিতা
- বিতর্ক প্রতিযোগিতা
- কবিতা আবৃত্তি
- আলোচনা সভা
- স্মরণিকা প্রকাশ
- বাংলাদেশের মেরিটাইম বিষয়ক সচিত্র জার্নাল প্রকাশ
- দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শন
- ডিজিটাল বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর জীবনী প্রদর্শন
- বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত ব্যানার ও পোস্টার প্রদর্শন
- রক্তদান কর্মসূচি
- বাংলাদেশ ক্লিনিং

সম্পাদকীয়

বিশাল সমুদ্র ও তার সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও মেরিটাইম বাংলাদেশে রূপান্তর করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, গবেষণা ও সম্পদ আহরণ, আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সমুদ্র সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়টি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

'মুজিববর্ষ ২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিএসএমআরএমইউ একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে স্মরণিকা প্রকাশ করতে পেরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি অত্যন্ত আনন্দিত।

উক্ত স্মরণিকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থীদের লেখার মাধ্যমে সজ্জিত হয়েছে। স্মরণিকাটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে লেখকদের নবতর চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, রচনা, মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারসহ নানা বিষয় নিয়ে প্রকাশিত এ স্মরণিকায় বঙ্গবন্ধুকে নবতর রূপে দেখতে পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।

যেসব লেখকদের লেখা ধারণ করে স্মরণিকার কলেবর সজ্জিত হয়েছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। স্মরণিকা প্রকাশের ব্যাপারে উপাচার্য মহোদয়ের আন্তরিক আগ্রহ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই সঙ্গে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এছাড়া সম্পদনা পরিষদের অক্লান্ত পরিশ্রমী সকল সদস্য এবং মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রকাশনাটির নিরঙ্কুশ পুঙ্খানুপুঙ্খতা রক্ষায় অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন

সভাপতি
সম্পাদনা পরিষদ
'মুজিব শতবর্ষ-২০২০' স্মরণিকা প্রকাশ কমিটি

সূচিপত্র

০৮

বঙ্গবন্ধু ও মেরিটাইম বাংলাদেশ

রিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল
স্বর্ণা দত্ত

১৪

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সংগ্রামী জীবন

২০

বঙ্গবন্ধু: স্মৃতিতে অম্লান

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংগ্রাম: স্মৃতিচারণ
ড. আফতাব আলম খান

মন মুকুরে বঙ্গবন্ধু: স্মৃতিতে অম্লান
কমডোর এ এম কামরুল হক

২৬

বঙ্গবন্ধু: চির উদ্ভাসিত চেতনা

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন
ড. আলতাফ হোসেন
ওয়াহিদুল শেখ

মানবিক বঙ্গবন্ধু
এ জেড এম জালাল উদ্দিন

২১০০ সালের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা
ড. মোঃ আবুল হোসেন

সমৃদ্ধ অর্থনীতির বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু
খন্দকার আতিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধু ও আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন
রাজু আহমেদ

৪৪

বঙ্গবন্ধু: মেরিটাইম স্থপতি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ পর্যটন
অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান

বঙ্গবন্ধু: এক নৌ স্বপ্নের কান্ডারি
ক্যাপ্টেন আরিফ মাহমুদ

৪৯

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধু

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শামসুল হক এর সাক্ষাৎকার
আতকিয়া অসিমা

কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমানের সাক্ষাৎকার
সহিদা আক্তার

৫৪

বঙ্গবন্ধু: কবিতায় চিরঞ্জীব

৬৩

তরুণ প্রজন্মের চেতনায় বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন, ছাত্ররাজনীতি ও তরুণ প্রজন্মের অঙ্গীকার
মোঃ বায়েজীদ মাহমুদ

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি
সামিউল হক

বঙ্গবন্ধু ও আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা
সুদীপ্ত রায়

জন্মশতবর্ষে মৃত্যুহীন প্রাণ বঙ্গবন্ধু
রাসনুন মেহনাজ

শিশুর জন্য, সংগ্রামী মহানায়ক
তারিক রোবন

বঙ্গবন্ধু ও বর্তমান
কাজী গোলাম দস্তগীর আহাদ

এক মুজিব ও বাংলাদেশ
মেহযাবীন নূর মিসো

৭৬

তরুণ প্রজন্মের চেতনায় মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

মুক্তিযুদ্ধের ছোট গল্প
সাইফ খান সানি

বুক পকেটের চিঠি
মোঃ আরমান হোসেন

মুক্তিযুদ্ধের একটি বাস্তব চিত্র
ইহসানুল হক

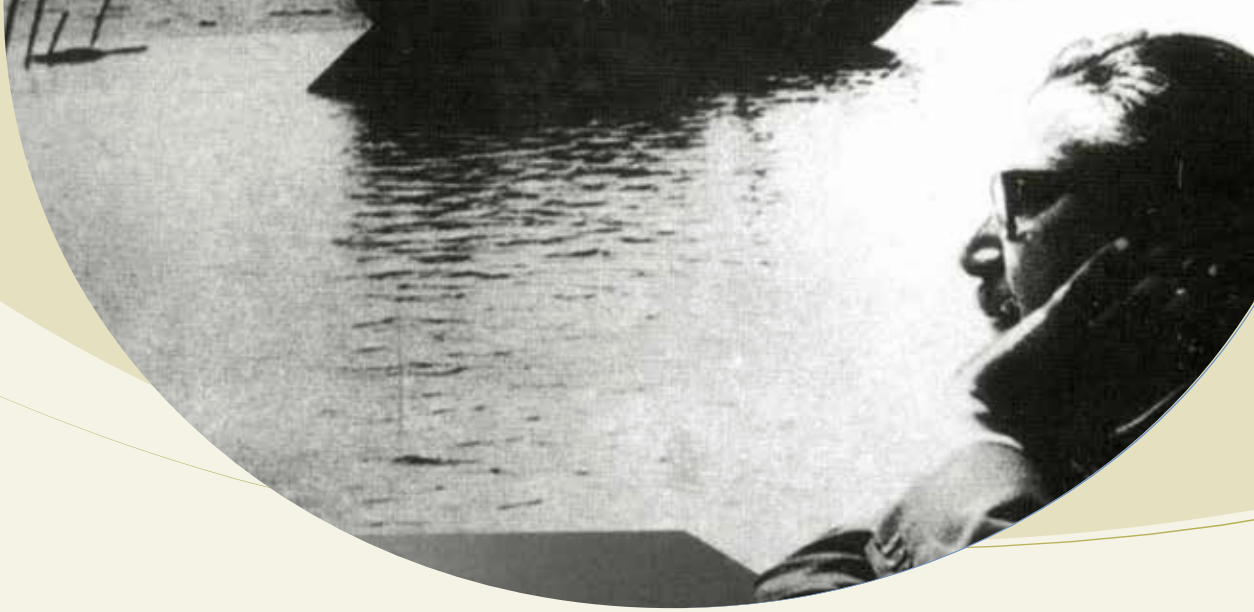

বঙ্গবন্ধু ও মেরিটাইম বাংলাদেশ

এম খালেদ ইকবাল
স্বর্ণা দত্ত

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের বাংলাদেশ। এদেশে রয়েছে সমুদ্র ও অসংখ্য নদ-নদী, যা এদেশের সৌন্দর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। নদীগুলো বাংলাদেশের ওপর দিয়ে অবিরামভাবে প্রবাহিত হয়ে দেশকে চির সবুজ রূপ দান করেছে। এসব নদ-নদীর মধ্যে মধুমতী নদীটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। নদীটি গোপালগঞ্জ জেলাকে করেছে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। এর শাখা নদী বাইগারের তীরে টুঙ্গিপাড়া গ্রামের অপরূপ মনোরম পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নদীমাতৃক ও মেরিটাইম বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করায় সমুদ্র উপকূলীয় প্রান্তিক মানুষের জন্য তাঁর বিশেষ দরদ ছিল। তিনি নদী ও সমুদ্র সম্পদের উন্নয়নে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে অসাধ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন বলেই তাঁকে মেরিটাইম ভিশনের স্থপতি বলা হয়।

বঙ্গবন্ধুর দিনযাপনের সুখ-দুঃখের গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে নদী ও সমুদ্রের আখ্যান। তাঁর সব সময়ের সুখ-দুঃখের সঙ্গী নদী। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বঙ্গবন্ধু ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা যেতেন নৌপথে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাবার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে নদীপথেই ঢাকা থেকে স্টিমারে করে রাতে রওনা দেন গোপালগঞ্জের উদ্দেশ্যে। পরদিন ভোরবেলা পাটগাতি স্টেশনে স্টিমার এসে পৌঁছালে মধুমতী নদী পার হয়ে বাড়িতে পৌঁছান। পুত্রের সান্নিধ্যে পিতা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এ ছাড়া তিনি ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভে ১৯৪৯ সালে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য জাহাজে করে গোপালগঞ্জ গিয়েছিলেন। ফেরার পথেও জাহাজে করেই নারায়ণগঞ্জ এসেছেন। কারাবন্দি অবস্থায় নৌপথেই এক জেল থেকে অন্য জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নদীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল বাল্যকালে এবং সারা জীবনব্যাপী ব্যাপৃত ছিল। তাই স্বাধীনতার পরে ক্ষমতাভার গ্রহণ করে তিনি নদী ও সমুদ্রের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নও সাধন করেছেন।

পাকিস্তানি আধা-ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মধুমতির তীরে জন্ম নেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে বাংলাদেশের জন্য আমরা দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম করেছিলাম, তাঁর ঠিকানাও ছিল আমাদের তিনটি প্রধান নদীর নামে।

'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'—এটিই ছিল আমাদের রাজনৈতিক ঠিকানা।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যেমন পরস্পর অভিন্ন, তেমনি সমুদ্র, নদ-নদীসহ প্রাকৃতিক জলসম্পদ ও নৌপরিবহন ব্যবস্থা এ দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; যার সঙ্গে মিশে আছেন কালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ কারণেই হয়তো অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন—

"যতদিন রবে পদ্মা-মেঘনা-গৌরী যমুনা বহমান,
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

আসন্ন মুক্তিযুদ্ধে নদী যে নির্ধারক শক্তি হয়ে উঠবে স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা জানতেন। বঙ্গবন্ধু বিলক্ষণ জানতেন বাংলাদেশের মূলশক্তি নদ-নদী ও সমুদ্র। তাই আমরা দেখি, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণেতিনি বলেছেন, "আমরা ওদের পানিতে মারবো।" আমরা এও দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর এই হুঁশিয়ারি অমোঘ সত্যে পরিণত হয়েছিল। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী বৃহৎ নদীবিচ্ছিন্ন বা বিল ও হাওর এলাকাগুলোতে যেতে পারেনি। সেখানে গড়ে ওঠা মুক্তাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং অধিকৃত এলাকায় গেরিলা হামলা চালিয়েছেন। বর্ষাকালে যখন নদীগুলো টইটম্বুর হয়ে উঠতে শুরু করে; মুক্তিযোদ্ধারা যখন নদীপথে একের পর এক আক্রমণ শুরু করে; তখন পাকিস্তানি বাহিনীর ক্রমাগত ঢাকার দিকে পিছু হটা ছাড়া উপায় ছিল না।

বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবায়ন করেছিলেন অনেক অসাধ্য কর্মসূচির। একটি দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর একটি সময়োপযোগী আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নদ-নদী ও সমুদ্র আমাদের অমূল্য সম্পদ, বাংলাদেশের অস্তিত্বের অংশ এবং অদূর ভবিষ্যতে অনাদর-অবহেলায় এ সম্পদ ধ্বংস হতে পারে । এজন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের মতো কঠিন কাজের শত ব্যস্ততার মধ্যেও নদ-নদী খননের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে ভোলেননি তিনি।

প্রিয় মাতৃভূমির শাসনভার হাতে নিয়েই বাংলাদেশের নৌ-চলাচল ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমুদ্র ও নদ-নদী নির্ভর, কৃষিপ্রধান ও প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ নির্ভর প্রিয় মাতৃভূমিকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে আত্মনির্ভরশীল করতে অমূল্য জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার অনস্বীকার্য। সেজন্য নদ-নদী সচল রাখা, নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উন্মুক্ত জলসম্পদ রক্ষা করা আবশ্যক। তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনসহ নানা ঝুঁকি মোকাবিলায় শত ব্যস্ততা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি নদী খননে মনোযোগী ছিলেন এবং সমুদ্রের উন্নয়নে গ্রহণ করেছেন বহুমুখী উদ্যোগ।

ঔপনিবেশিক আমলে, ১৮৩৪ সালে বাংলার নদীতে প্রথম জাহাজ পরিচালনা শুরু হয় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক স্টিমারের যাত্রা দিয়ে। এরপর নানা পথ পরিক্রমার পর ১৯৫৮ সাল থেকে পথচলা শুরু করে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, যা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছে বিআইডব্লিউটিএ'তে। বাংলাদেশে বর্তমানে নদীবন্দর রয়েছে ২৯টি। এসব বন্দরের দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধুনিকায়নের কাজ করছে এই সংস্থা। নদী ও খাল মিলিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যতগুলো নৌপথ রয়েছে সেগুলোর নাব্যতা ঠিক থাকছে কিনা সেটি দেখাশোনা করে বিআইডব্লিউটিএ। এ সংস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানের রেখে যাওয়া 'খনক' নামের একটি মাত্র ড্রেজার (খননযন্ত্র) দিয়ে বিশাল আয়তনের অভ্যন্তরীণ নৌপথের নিয়মিত পলি অপসারণ ও নদী খনন সম্ভব নয়। শতভাগ যৌক্তিক এ উপলব্ধি থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনামলে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) জন্য দুই দফায় বিদেশ থেকে সাতটি ড্রেজার সংগ্রহ করেছিলেন; যেগুলো এখনও বিআইডব্লিউটিএর বহরে যুক্ত ও সচল রয়েছে। সেসব জলযান বা ড্রেজার হলো ডেল্টা-১, ডেল্টা-২, ড্রেজার-১৩৫, ড্রেজার-১৩৬, ড্রেজার-১৩৭, ড্রেজার-১৩৮ ও ড্রেজার-১৩৯।

নৌপথের পলি অপসারণ ও নদী খননের জন্য স্বাধীন দেশে ড্রেজার আমদানির মতো সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নদীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌপরিবহন ব্যবস্থা যাতে ব্যাহত না হয়, নৌপথের পলি অপসারণ ও নদী খনন কাজ যাতে সঠিকভাবে হয়, এজন্য স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহন খাতের সমন্বয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নৌপরিবহনের গুরুত্ব বিবেচনায় বিশ্বখ্যাত একজন রাষ্ট্রনায়ক হয়েও তিনি নিজেই প্রথম এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় স্বার্থে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে পুনর্বিন্যাস করে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিআইডব্লিউটিসি মূলত দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নৌপথে ফেরি সার্ভিস, যাত্রীবাহী সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস, শিপ রিপেয়ার সার্ভিস, রেকার সার্ভিস পরিচালনা করে। দেশজুড়ে বিভিন্ন রুটে পণ্য এবং যাত্রী পরিবহন কার্যক্রম এবং এর নিরাপত্তার বিষয়টি এই সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ২৮ নম্বর অধ্যাদেশ অনুসারে ৬০৮টি নৌযান নিয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ২০টি ছিল যাত্রীবাহী জাহাজ। এরপর একে একে যাত্রীবাহী জাহাজ, ফেরি, সি ট্রাক, কার্গো ও ওয়াটার বাস সংযুক্ত হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিআইডব্লিউটিসি'র যাত্রীবাহী জাহাজগুলো আন্তঃআঞ্চলিক, উপকূলীয় এবং উপআঞ্চলিক নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করে থাকে। বর্তমানে ছোট-বড় প্রায় দশ হাজার অভ্যন্তরীণ ও সমুদ্র উপকূলীয় জাহাজ সারা দেশজুড়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এসব জাহাজ দেশের শতকরা ৯০ শতাংশ তৈলজাত দ্রব্য, ৭০ শতাংশ মালামাল এবং ৩৫ শতাংশ যাত্রী বহন করে থাকে। এ সংস্থার উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নেও বঙ্গবন্ধু কাজ করে গেছেন।

১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দুই দেশের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রধান প্রধান নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের ওপর সমীক্ষা পরিচালন, উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার গ্রিড সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ২৪ নভেম্বর অংশগ্রহণকারী দুই দেশের মধ্যে

যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীগুলো থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট স্বাক্ষরিত হয়। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের কাজ সম্পাদনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ছাড়াও উভয় দেশের সরকারের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্দেশিত যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণ করাও যৌথ নদী কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। কমিশনের প্রতিবেদন ১৯৭৫, ১৯৭৮ ও সবশেষে ১৯৯৬ সালের গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তিতে উপনীত হতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে নৌপরিবহন ও বাণিজ্য ব্যবস্থাকে জোরদার করতে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ১৯৭২ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আন্তর্দেশীয় নৌপরিবহন ও বাণিজ্য প্রটোকল প্রথম স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সকল বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। যুগোপযোগী এ প্রটোকল নৌপরিবহন ও বাণিজ্য ব্যবস্থায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কেবল নদীপ্রেমীই ছিলেন না, প্রকৃতিপ্রেমীও ছিলেন তিনি। কালের এ মহানায়ক বাংলাদেশের অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনকে নিয়েও ভাবতেন। দূরদর্শী এ নেতা সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদগ্রীব ছিলেন। প্রাকৃতিক এ বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শেলা নদীর বুক চিরে বাণিজ্যিক নৌযান চলাচল অব্যাহত থাকলে নিকট-ভবিষ্যতে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে–এমন আশঙ্কাও জেগেছিল তাঁর মনে। যেহেতু আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর মোংলার সঙ্গে শিল্প ও বন্দরনগরী খুলনাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নৌ যোগাযোগ অপরিহার্য ছিল, সেহেতু মোংলা বন্দরের যাত্রার শুরু থেকেই শেলা নদী দিয়ে সব ধরনের বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করত। তাই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথটি বন্ধ করাও সম্ভব ছিল না।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, সময়ের প্রয়োজনেই শেলা নদীকে ভারী নৌযান চলাচলমুক্ত করতে হবে, অন্যথায় সুন্দরবনকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে। এ উপলব্ধি থেকে তিনি মোংলা বন্দর ও খুলনার মধ্যে বিকল্প নৌপথ তৈরির উপায় খুঁজতে থাকেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সেখানকার পরিস্থিতি সরেজমিন পরিদর্শন করতে ছুটে যান তৎকালীন নৌমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী। ঢাকায় রাষ্ট্রীয় দপ্তরে বসে ওসমানীকে পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি তিনি, বিকল্প নৌপথ খুঁজতে পরবর্তী সময়ে নিজেও ছুটে গিয়েছিলেন মোংলায়।

রাষ্ট্রনায়ক ও সেনানায়কের পরিদর্শন শেষে লুপ কার্টিং ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার ঘষিয়াখালী থেকে রামপাল উপজেলার বেতিবুনিয়া পর্যন্ত ৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার সংযোগ খাল খনন করা হয়। এরপর ১৯৭৪ সালে কার্যক্রম শুরু হয় মোংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল বা নৌপথের; যার মূল লক্ষ্য ছিল–সুন্দরবনকে অক্ষত রেখে মোংলা সমুদ্রবন্দরের পণ্য আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বল্পদূরত্বের বিকল্প পথ আবিষ্কার করা।

মোংলা থেকে ঘষিয়াখালী পর্যন্ত আলোচিত এই নৌপথের দূরত্ব ৩১ কিলোমিটার। নতুন নৌপথটি চালুর অল্পদিনের মধ্যেই সেটি সার্বিক বিবেচনায় হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নৌ-যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নতুন এ নৌপথ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে মোংলা-ঘষিয়াখালী নৌপথ 'বাংলাদেশ-ভারত নৌবাণিজ্য প্রটোকল রুট' এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এর গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মোংলা বন্দর, খুলনা ও নোয়াপাড়া নদীবন্দর, চালনা, রায়মঙ্গল ও ভারতের সঙ্গে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে মোংলা-ঘষিয়াখালী নৌপথটি এখন অপরিহার্য।

বঙ্গবন্ধুর এই পদক্ষেপের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, বিকল্প নৌপথ তথা মোংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের মাধ্যমে সমুদ্রবন্দর মোংলার সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে দেওয়ায় জাহাজ চলাচলে সময়, অর্থ ও জ্বালানি তেলের ব্যয় কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ-ভারত নৌবাণিজ্য প্রটোকল রুটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় চ্যানেলটি আন্তর্জাতিক নৌপথের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং তৃতীয়ত, শেলা নদীর ওপর দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বন্ধ হওয়ায় পরিত্যক্ত বিষাক্ত জ্বালানি তেল ও ভয়াবহ শব্দদূষণ থেকে সুন্দরবন রক্ষা পেয়েছে। ফলে এই প্রাকৃতিক বনের অগণিত প্রজাতির জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ধ্বংসঝুঁকিও কমেছে। সুতরাং মোংলা-ঘষিয়াখালী বিকল্প চ্যানেল তৈরির বঙ্গবন্ধুর ওই পদক্ষেপ ছিল যুগান্তকারী; যা ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত।

তাঁর শাসনামলেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় অভ্যন্তরীণ নৌপথের জরিপ প্রতিবেদন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৪ সালে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে প্রথম জানা যায়, বাংলাদেশে নৌপথের মোট দৈর্ঘ্য ২৫,১৪০ কিলোমিটার; যা বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের পর ৩০ বছরে মাত্র ৫,৯৬৮ কিলোমিটারে নেমে এসেছে। বিলুপ্ত বা হারিয়ে যাওয়া বিশাল আয়তনের সেই নৌপথ পুনরুদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নেদারল্যান্ডসের সংস্থা NEDECO' এর একটি বিশেষজ্ঞ দল ১৯৬৫-৬৭ সময়কালে ওই জরিপ চালালেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার তা যথাসময়ে প্রকাশ করেনি; কিন্তু বঙ্গবন্ধু উক্ত জরিপ শেষ করে প্রতিবেদনটি প্রকাশের উদ্যোগ নেন। সুতরাং সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায়, বঙ্গবন্ধুই এ দেশের সমুদ্র, নদ-নদী, নৌপথ ও সুন্দরবন রক্ষা এবং নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রথম পথপ্রদর্শক।

প্রায় আড়াই হাজার বছরের নৌবাণিজ্যের গৌরবময় প্রামাণ্য ইতিহাস রয়েছে বাঙালির। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বিশাল জাহাজ বহর নিয়ে বুদ্ধ গুপ্ত নামে এক রাজন্যের মালয় দেশের রাজদরবারে যাওয়ার কথা আজও খোদিত রয়েছে প্রস্তরফলকে। টলেমির মতো ইতিহাসবিদের প্রাচীন মানচিত্রে চিহ্নিত রয়েছে বাংলার সমৃদ্ধ নৌপথ। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের বিবরণীতে রয়েছে বাংলার নৌসম্পদ আর সমৃদ্ধির কথা। জাহাজনির্মাণে বাংলার নিপুণ দক্ষতার দুনিয়াজোড়া খ্যাতির কারণে অটোমান সম্রাট ১৪-১৫ শতকে তার নৌবহরের জন্য যুদ্ধজাহাজ বানিয়ে নিয়ে যান এই বাংলা থেকে। এ ছাড়াও চট্টগ্রামে নির্মিত যুদ্ধজাহাজ যুক্তরাজ্য ও জার্মান নৌবাহিনীতেও ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সমৃদ্ধ মেরিটাইম ইতিহাস সম্পর্কে জানতেন। বিশেষত জানতেন জাহাজনির্মাণ শিল্প এবং বাংলার জাহাজ নির্মাতাদের সম্পর্কে। তিনি জানতেন বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদকে কাজে লাগাতে হলে এর উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই স্বাধীনতার পরে ক্ষমতাভার গ্রহণ করে তিনি বাংলাদেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মেরিটাইম খাতের উন্নয়নে কাজ করেছেন। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য নদী ও সমুদ্র পথে পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধন করেছেন।

বাংলার আধুনিক ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন, দেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির সূচনা ঘটাতে চাইলে কী অসীম ভূমিকা রাখতে পারে নৌ ও সমুদ্র সম্পদ। স্বাধীনতার পর তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, সক্রিয় উদ্যোগ এবং প্রেরণায় যুদ্ধবিধ্বস্ত নৌঅবকাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। পণ্য পরিবহন ও বৈদেশিক বাণিজ্য সচল করতে সবার আগে দেশের প্রধান প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দরের পুনরুদ্ধার কার্যক্রম হাতে নেন তিনি। রাশিয়ার মাইন অপসারণ ফোর্সের সহায়তায় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন অপসারণের কার্যকর পদক্ষেপও গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। পাশাপাশি নতুন কিছু জাহাজও সংগ্রহ করেন।

মালামাল আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে জাহাজ ও জলযোগাযোগ সবচেয়ে সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য। এ ছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগরে উন্মুক্ত। ফলশ্রুতিতে আমাদের আমদানি ও রপ্তানির প্রায় নব্বই শতাংশ সমুদ্রপথেই হয়ে থাকে। একটি সমুদ্র তীরবর্তী নদীমাতৃক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নিজস্ব বিভিন্ন আকৃতির কার্গো, কনটেইনার এবং ট্যাংকার জাহাজের বহর থাকা অত্যাবশ্যকীয়। দেশের স্বাভাবিক এবং জরুরি পরিস্থিতিতে এ ধরনের জাহাজ বহরের ভূমিকা অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাই এ উদ্দেশ্যকে সফল করার নিমিত্তে আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ অনুসারে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে 'বাংলার দূত' এবং ১৯৭৩ সালে 'বাংলার সম্পদ' অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই কোস্টারসহ ১৪টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করে।

জাহাজ নির্মাণে প্রচুর দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে জাহাজনির্মাণ শিল্পে স্বল্প খরচে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। আর এ কারণে নির্মাণ খরচ অনেক কম। দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় ভৌগোলিক সুবিধা এ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়টি বহু পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই জাহাজনির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় তিনি সোচ্চার ছিলেন। তাঁর নির্ধারিত পথ অবলম্বন করে বর্তমানে বাংলাদেশে ২০০টির মতো জাহাজনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও খুলনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

অভ্যন্তরীণ উপকূলীয় যোগাযোগ এবং মাছ-ধরা নৌযান নির্মাণ করার জন্য শিপইয়ার্ড গড়ে উঠেছিল। বর্তমান শিপইয়ার্ডগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম নারায়ণগঞ্জের ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এটির পরিচালনার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের (বিএসইসি) ওপর। বঙ্গবন্ধু এই শিপইয়ার্ডের উন্নয়নেও কাজ করে গেছেন।

খুলনা শিপইয়ার্ড যাত্রা শুরু করে ১৯৫৭ সালে। স্বাধীনতার পর খুলনা শিপইয়ার্ডের দায়িত্ব পায় প্রথমে বিআইডিসি এবং পরে বিএসইসি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথকে অনুসরণ করেই খুলনা শিপইয়ার্ডের জাহাজনির্মাণ শিল্পের সুনাম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ছে। খুলনা শিপইয়ার্ড ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ছোট ও বড় মাপের যুদ্ধজাহাজ ছাড়াও সাবমেরিন টাগ, অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে চলাচল উপযোগী কনটেইনার জাহাজ, অয়েল ট্যাংকার, কার্গো কাম কনটেইনার জাহাজ, সেলফ প্রপেলড ক্রেন বোট, হাইড্রোগ্রাফি সার্ভে ভেসেল ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত নৌযান তৈরিতে সক্ষমতা অর্জন করেছে।

১৯৬০ সালের প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসে গ্রিক জাহাজ এম ভি অলপাইন আটকে পড়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড সমুদ্র উপকূলের ফৌজদারহাট এলাকায়। দীর্ঘ কয়েক বছর আটকে থাকার পর ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম স্টিল মিলের কর্মীরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় জাহাজটি ভাঙতে শুরু করে এবং পরবর্তীতে তা বিক্রি করে। এভাবেই মূলত বাংলাদেশে জাহাজভাঙার উৎপত্তি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বেশ কিছু জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনাজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রামের পোতাশ্রয় এবং তাঁর নিকটবর্তী জলভাগে বহুসংখ্যক ডুবে যাওয়া জাহাজ জমা হয়েছিল। তাই যুদ্ধের পরেই নিরাপদ নোঙর ও চলাচলের

স্বার্থে বন্দরটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি জাহাজ আল আব্বাস বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চট্টগ্রামে আটকা পড়ে। সেই সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত রাশিয়ান একটি দল জাহাজটিকে ফৌজদার হাট উপকূলে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে, ১৯৭৪ সালে কর্ণফুলী মেটাল ওয়ার্কশপ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি জাহাজটি স্ক্র্যাপ হিসেবে কিনে নিয়ে ভাঙা আরম্ভ করলে স্বাধীন বাংলাদেশে জাহাজভাঙা শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। এরপর থেকে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে এ শিল্পের প্রসার হতে থাকে। জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য সংস্থা 'আঙ্কটাড' প্রকাশিত 'রিভিউ অব মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট ২০১৯' শীর্ষক প্রকাশনার তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশ জাহাজভাঙা শিল্পে শীর্ষ স্থান দখল করে আছে।

১৯৬২ সালে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একমাত্র নৌশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিল পাকিস্তান নৌবাহিনী। স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে মেরিন একাডেমির পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু মার্চেন্ট মেরিন ক্যাপ্টেন এম এল রহমানকে প্রথম বাঙালি কমান্ড্যান্ট হিসেবে এ একাডেমিতে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর নেওয়া 'ডেভেলপমেন্ট অব মেরিন একাডেমি' প্রকল্পের আওতায় মেরিন একাডেমির অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধিভুক্ত হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত একাডেমি থেকে চার হাজারের বেশি নৌবিদ্যা এবং নৌপ্রকৌশল শাখার ক্যাডেট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বাণিজ্যিক জাহাজে মাস্টার মেরিনার এবং নৌপ্রকৌশল পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্রের সম্পদ আহরণ করার জন্য ১৯৭৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের অধীনে একটি প্রকল্পের আওতায় 'ফিশারিজ ট্রেনিং সেন্টার' নামে বাংলাদেশে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্কলারশিপ নিয়ে এই একাডেমি থেকে প্রচুর ক্যাডেট দেশ-বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছেন।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বা বিএফডিসি বাংলাদেশে মৎস্যের জন্য মৎস্য পালন, হিমাগারে সংরক্ষণ, নিলাম, পরিবহন পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ৪ নম্বর অধ্যাদেশ অনুসারে পূর্ব পাকিস্তান মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর ১৯৭৩ সালে ২২ নম্বর আইনের মাধ্যমে এটিকে 'বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন' হিসেবে নামকরণ করা হয়। এ কর্পোরেশন খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহযোগিতায় ১৯৭২ সালে বঙ্গোপসাগরে সাউথ প্যাসেজ, এলিফ্যান্ট পয়েন্ট, ইস্ট অব সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড নামক চারটি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। এসব ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। এই কর্পোরেশন কাপ্তাই হ্রদে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশের সমুদ্রের চলমান মাছ ধরার নৌকা এবং জাহাজের বৃহৎ অংশের মালিকানা এটির অধীনে রয়েছে। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলারগুলোর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটি।

স্বাধীনতার পর দেশের ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর গবেষণা ত্বরান্বিত করার জন্য সার্বিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। উত্তরবঙ্গে খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য বিশেষভাবে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ করার নির্দেশ প্রদান করেন। বঙ্গোপসাগরে তেল ও গ্যাস আহরণের জন্য সেসময় ছয়টি বিদেশি তেল কোম্পানিকে বঙ্গোপসাগরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য লিজ প্রদান করেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অতলে নিহিত অমিত সম্ভাবনা আবিষ্কারেও বিলম্ব করেননি দূরদর্শী এ নেতা। একজন স্বপ্নদর্শী নেতা হিসেবে 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ মেরিটাইম বাংলাদেশ হিসেবে কল্পনা করেছেন। যা বাংলাদেশের মেরিটাইম ইতিহাসে মাইলফলক।

সমুদ্রে নিজেদের কার্যকর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘেরও প্রায় এক দশক আগে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' প্রণয়ন করেন। মূলত ১৯৭৪ সালে আইনটি প্রণয়নের মাধ্যমে উপকূলীয় সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা, মেরিন সংরক্ষিত এলাকা, শিপিং, ফিশারিজ এবং মেরিটাইম গভর্ন্যান্সের মতো বিষয়গুলো নির্ধারণ করা সহজতর হয়েছে। এ আইনটি আমাদের বিভিন্ন মেরিটাইম জোনস এর সমুদ্রসীমা নির্ধারণে একটি চমৎকার রোডম্যাপ। এ আইনে সমুদ্রে আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব উল্লেখ করার পাশাপাশি মেরিটাইম নিরাপত্তার জন্য নীতি নির্ধারণও করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, সমুদ্রসম্পদ সুরক্ষা ও নৌবাণিজ্য নির্বিঘ্ন রাখতে বাংলাদেশের জন্য একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনে উদ্যোগী হন তিনি। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ভূরাজনৈতিক প্রয়োজনে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করতে হবে। তাই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে বেশ কয়েকটি রণতরী ও নৌঘাঁটি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি

পরিদর্শন করেন এবং সেখান থেকে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও খুলনার বেশ কয়েকটি নৌঘাঁটি উদ্বোধন করেন। এ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু সদ্য ক্রয়কৃত রণতরী করে সমুদ্রে গমন করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ায় মোট ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এলাকা এখন বাংলাদেশের। এ ছাড়া ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে সব ধরনের প্রাণিজ-অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকারও এখন বাংলাদেশের।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রসম্পদ বাংলাদেশকে যেমন দিতে পারে আগামী দিনের জ্বালানি নিরাপত্তা, তেমনি বদলে দিতে পারে অর্থনীতির সামগ্রিক চেহারা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাগরে প্রাণিজ-অপ্রাণিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার জিডিপিকে বর্ধিত করতে পারে খুব সহজেই। এমনকি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সামুদ্রিক খাবার রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব। অন্যদিকে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে সমুদ্রনির্ভর ব্লু ইকোনোমির বদৌলতে। সোনার বাংলাদেশ গড়ার পথে ব্লু ইকোনোমির নীল বিপ্লব এখন তাই সময়ের দাবি। সমুদ্রের এরূপ সম্ভাবনার কথা বঙ্গবন্ধু বহু পূর্বেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই ছয় দফা আন্দোলনের ষষ্ঠ দফায় কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করার দাবি তিনি পেশ করেছিলেন।

সমগ্র বিশ্বে ব্লু ইকোনোমি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বিগত বছরগুলোতে যতগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে তার সবগুলোতেই আলোচনার মূল বিষয় ছিল ব্লু ইকোনোমি। ২০১২ সালে রিও+২০, সমুদ্র বিষয়ক এশীয় সম্মেলন, ২০১৩ সালে বালিতে অনুষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা এবং ব্লু গ্রোথ ইত্যাদি সম্মেলনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সংস্থা (OECD), জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), বিশ্ব ব্যাঙ্ক, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়ন কৌশলের মূলেও থাকছে ব্লু ইকোনোমি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্লু ইকোনোমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

এই প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফসল হলো বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান। ডেল্টা অর্থ ব-দ্বীপ। নদীর মোহনাস্থিত প্রায় ব-অক্ষরের আকারবিশিষ্ট যে দ্বীপ, তাকেই বলা হয় ডেল্টা। বাংলাদেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চল। প্রকৃতপক্ষে নদীমাতৃক এই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যথাযথ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ওপর। কেননা এখানকার জনগণের জীবনযাত্রায় নদ-নদী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। বন্যা ও খরা এই উভয়মুখী সংকটে বাংলাদেশের জনগণ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ যখন ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, তখন এই সংকট কাটিয়ে ওঠা একান্ত জরুরি। কারণ সঠিক নদী ও পানি ব্যবস্থাপনার অভাবে এবং বন্যা, খরা ও আরও নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বাংলাদেশ বারংবার পিছিয়ে যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই ক্ষতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। তাই ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই সমস্যা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠতে পারে। এই প্রেক্ষিতে নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতায় বাংলাদেশও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বহু ভূমি সমুদ্র থেকে তুলে আনতে পারে। এটি বাস্তবে রূপদান করতে পারলে আমাদের জন্য উন্মোচিত হবে এক নতুন দিগন্ত।

এছাড়া মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি ও সমতা অর্জন এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি সরকারের একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সমুদ্র বাংলাদেশের জন্য অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। মেরিটাইম ভিশনের স্থপতি স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে সামুদ্রিক সম্পদের সরবরাহ, সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে কাজ করে গেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথ ধরেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করবে এবং ভিশন ২০৪১ পূরণের মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত মেরিটাইম বাংলাদেশে পরিণত হবে।

রিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি
উপাচার্য, বিএসএমআরএমইউ

স্বর্ণা দত্ত
প্রভাষক (বাংলা)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সংগ্রামী জীবন

১৯২০

১৭ মার্চ: গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।

১৯২৭

সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতির পিতার প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রজীবনের সূচনা হয়।

১৯৩৯

সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা করার কারণে বঙ্গবন্ধু প্রথম কারাবরণ করেন।

১৯৪৪

নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে অভিষিক্ত হন।

১৯৪৮

২৩ ফেব্রুয়ারি: তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু তার তাৎক্ষনিক প্রতিবাদ করেন।

২ মার্চ: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।

১১ মার্চ: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সাধারণ ধর্মঘট আহবানকালে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন।

১৯৪৯

২৩ জুন: পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫২

২১ ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন সালাম, রফিক, বরকত সহ আরও অনেকে। জেল থেকে বঙ্গবন্ধু এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন এবং একটানা তিনদিন তা অব্যাহত রাখেন।

১৯৫৩

১৬ নভেম্বর: প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলীম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৪

১০ মার্চ: সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে বিজয়ী হয়। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে বিজয়ী হন।

১৪ মে: বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বয়ঃকণিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৫৫

১৭ জুন: ঢাকার পল্টনের জনসভা থেকে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দাবী করেন।

১৯৫৬

১৬ সেপ্টেম্বর: শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিবিরোধী এবং গ্রামীণ সহায়তা বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেন।

১৯৫৭

৩০ মে: দলের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করার তাগিদে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৬৬

১৮ মার্চ: আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা গৃহীত হয়। এরপর তিনি ৬ দফার পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেন। এ সময় তিনি ৩ মাসে ৮ বার গ্রেফতার হন।

১৯৬৮

৩ জানুয়ারি: পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামী করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।

১৯৬৯

২২ ফেব্রুয়ারি: তীব্র গণআন্দোলনের মুখে সরকার 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' শিরোনামে মিথ্যা মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি: ছাত্রলীগ আয়োজিত রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে দেওয়া বিশাল সংবর্ধনা সভায় তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৭০

১২ নভেম্বর: পূর্ব বাংলায় ভয়াবহ ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসে ১০ লাখ মানুষ মারা যায়। বঙ্গবন্ধু তার নির্বাচনী প্রচারণা স্থগিত করে ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

৭ ডিসেম্বর: জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৭ ডিসেম্বর: প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন লাভ করে।

১৯৭১

৭ মার্চ: বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্বপ্ন চূড়ান্ত করা সেই ভাষণে বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধুর এই ভাষনে স্পষ্ট হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। সেইসাথে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপরেখা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীনতার ডাক দেন।

২৫ মার্চ: পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম গণহত্যা ও নৃশংসতম কালো রাত। সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগের খবরে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। রাত সাড়ে এগারটায় শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিচালিত 'অপারেশন সার্চ লাইট'।

২৬ মার্চ: পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হবার আগে ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১২টায় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। তাঁর ঘোষণাবার্তা বিডিআর ওয়্যারলেস এবং অন্যান্য মাধ্যমে দেশব্যাপি ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৭ এপ্রিল: বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে তৎকালীন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

২ ডিসেম্বর: বাংলাদেশ যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন ইয়াহিয়া খানের দেওয়া সমঝোতা প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করেন।

১৬ ডিসেম্বর: ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আসে আমাদের চূড়ান্ত বিজয়। কিন্তু বাঙালির মুক্তির স্বাদ অপূর্ণ রয়ে যায় স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানে নির্জন কারাভোগের কারণে।

১৯৭২

৮ জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তি লাভ। ঐদিন বঙ্গবন্ধু লন্ডনে তার হোটেলের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন, "আমি আমার জনগনের কাছে ফিরে যেতে চাই।"

১০ জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধু ইল্যাংন্ড থেকে ভারত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুঃ
স্মৃতিতে অম্লান

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংগ্রাম: স্মৃতিচারণ

আফতাব আলম খান

১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র বাঙালির মধ্যে একটি স্বপ্নের বীজ বপন হয়েছিল যা ১৯৭২ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ নেয়। এই স্বাধীনতার পেছনে যে মানুষটির অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল, সে মানুষটি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তাঁর এই অবদানের কতটুকু মূল্যায়ন করতে পেরেছে? একইভাবে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশকে উপভোগ করে যেতে পারেননি। মানুষটাকে খুব কাছ থেকে দেখার একটা ইচ্ছা মনের ভেতরে ছিল। ৬ দফা আন্দোলনের জন্য ১৯৬৪-৬৫ সময়কালে জনাব মুজিবুর রহমান (তখনও বঙ্গবন্ধু উপাধি তিনি পাননি) ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে অবস্থিত কারাগারে বন্দি ছিলেন। তখন আমার এক আত্মীয় (মাঝারি পর্যায়ে জেলকর্মকর্তা), যিনি বঙ্গবন্ধুর পরিচর্যা এবং অন্যান্য কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আমি আমার আত্মীয়ের সহায়তায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ব্যর্থ হই। আমার আত্মীয়ের কাছ থেকে কারাবন্দি বঙ্গবন্ধুর দৈনন্দিন জীবনের একটি চিত্র পেয়েছিলাম, যেখানে তাঁর প্রধান কাজ ছিল বই পড়া এবং লেখালেখি। বঙ্গবন্ধু আমার সেই আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলতেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, যেখানে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে পাকিস্তানিদের বিমাতাসুলভ আচরণ প্রধান বিষয় ছিল। আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর ১৯৬৭ তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই এবং সলিমুল্লাহ হলে অবস্থান করি। তখনও ১৯৬৯ এর ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়নি, কিন্তু দানা বাঁধতে শুরু করেছে। মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশিত হচ্ছিল। একদিন মিছিল নিয়ে সলিমুল্লাহ হলের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন শুনতে পেলাম সার্জেন্ট জহুরুল হককে মেরে ফেলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সার্জেন্ট জহুরুল হক 'আগরতলা মামলা'য় বন্দি ছিলেন। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুকে 'আগরতলা মামলা' থেকে মুক্ত করার পক্ষে 'ছাত্র আন্দোলন' আরও বেগবান হলো। ১৯৬৯ এর এই ছাত্র আন্দেলনের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করা হলো, স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের পতন হলে জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা দখল করে। জেনারেল ইয়াহিয়া নির্বাচন ঘোষণা করার পর সবাই নির্বাচনমুখী হয়ে পড়ে। ১৯৭০'র নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। আওয়ামী লীগ তখনকার নির্বাচনে সংসদ সংখ্যা পিপিপির থেকে অনেক বেশি থাকায় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র দাবিদার। সমস্যাটা শুরু এখানে–ভুট্টো সেটা মানতে পারল না। একটা জটিলতার সূত্রপাত হলো। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ হতে শুরু করল। সভা, মিছিল, মিটিংয়ে সমগ্র দেশ উত্তাল। তখনই এক মুহূর্তে রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তখনকার মানুষের মধ্যে নতুন দিকনির্দেশনা, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার এক মহান ব্রত হয়ে আবির্ভূত হলো। বঙ্গবন্ধুর সেদিনকার ভাষণে সকল মানুষের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো, সকল স্তরে সার্বিক অসহযোগিতা শুরু হয়ে গেল। অফিস, আদালত, কল-কারখানা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল। পাকিস্তানির প্রশাসন পুরোপুরি ভেঙে পড়ল। এমনই এক পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া ঢাকায় বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোকে নিয়ে এক সমঝোতা সভা ডাকলেন। সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। আমার যতদূর মনে আছে সভা হয়েছিল ২৩ মার্চ ১৯৭১। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া গেল না। ২৪ মার্চ ১৯৭১, সভা শেষ হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু দুপুরে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসায় ফিরে এলেন। সবাই আমরা খুবই উদগ্রীব ছিলাম সভার ফলাফলের ব্যাপারে। ২৪ মার্চ ১৯৭১ বিকেল ৪টা, আমরা সাধারণ মানুষ আর সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুর বাসায় সমবেত হলাম আলোচনার বিষয় ও ফলাফল জানার জন্য। বঙ্গবন্ধুর বাসার একবারে বাইরে রাস্তার ওপরে কালো রং করা লোহার চিকন বার দিয়ে তৈরি অতি সাধারণ গেটের সামনে আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম। আমি একেবারে লোহার গেট দুই হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু বাসা থেকে বেরিয়ে এলেন একেবারে গেটের সামনে। ভারী কালো চশমা, সাদা পাঞ্জাবি পরা বিশাল এক মানুষ। যেমন তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর তেমনি তাঁর বজ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল। দেখলেই কেমন যেন একটা আর্কষণ বোধ হতো। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর আলোচনার ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, "আজকের (২৪ মার্চ) আলোচনা মোটামুটি ভালো হয়েছে, তবে কোনো সমঝোতায় আমরা যাইনি, আগামীকাল (২৫ মার্চ) আমরা আবার আলোচনায় বসবো। আশা করি একটা সমঝোতা হবে।" এই বলে তিনি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বাসার ভেতরে চলে গেলেন। পরে জানা গেল ২৫ মার্চ সেই আলোচনা সভা হয়নি। কারণ ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো দুজনই করাচি ফিরে গেছেন। ২৫ মার্চ আমরা কয়েকজন কলাবাগান বাসস্টপের কাছে একটি খাবার দোকানে বসে চা পান করছিলাম। তখন আনুমানিক সন্ধ্যা ৮টার মতো বাজে। একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে, "আপনাদের মধ্যে একজন বঙ্গবন্ধুর বাসায় যান এবং বলেন যে ক্যান্টনমেন্ট গেটে (যা এখন জাহাঙ্গীর গেট) অনেক সৈনিক ভর্তি ট্রাকের বহর এবং ট্যাংক লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে এবং বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় আছে।" ৩২ নম্বর বাসায় একজনকে–যে ওই বাসায় প্রায় আসা যাওয়া করতক–পাঠানো হলো। ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর ফিরে যাওয়ার খবর সেই

লোকটির মুখে পাওয়া গেল। বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে ফিরে এসে সেই ছেলেটি আমাদের জানালো যে, বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে রাস্তায় ব্যারিকেড দিতে বলেছেন। রাস্তায় ট্রাক ও ট্যাংকের গতিবিধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে ব্যারিকেড দেওয়ার মতো তেমন কিছুই ছিল না এবং ছিল না পূর্বপ্রস্তুতিও। তবুও ৩২ নম্বর রাস্তার মুখে, মিরপুর রোডের ওপরে একটি কালভার্ট ছিল (এখন যে পান্থপথ তৈরি করা হয়েছে সেখানে একটি খাল ছিল, যা ৩২ নম্বর রোড এর সামনে ধানমন্ডি লেকে মিলিত হয়েছিল) সেখানে আশেপাশে যা পাওয়া গেল তা দিয়ে ব্যারিকেড দেওয়া হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে কলাবাগানের বসিরউদ্দিন রোডের ভেতর দিয়ে গ্রিনরোডে এসে একইভাবে আরেকটি কালভার্টের ওপরে ব্যারিকেড দেওয়ার চেষ্টা করি।

তখন প্রায় রাত সাড়ে দশটা। হঠাৎ ঢাকার পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন এর আকাশে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ, সার্চ লাইটের বিস্ফোরণ এবং ট্যাংকের গোলার শব্দ এক নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। আমরা যার যার মতো বাসায় ফিরে যাই। পুরো শহরে কারফিউ ঘোষণা করা হয়। ২৭ মার্চ সকালে কিছুক্ষণের জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়। রাস্তায় বেরিয়ে জানা গেল বঙ্গবন্ধুকে ২৫ মার্চ রাতেই বন্দি করা হয়েছে। কামাল এবং জামাল বঙ্গবন্ধুর দুই ছেলে, নিজেদেরকে বাঁচাতে সমর্থ হয়। বঙ্গবন্ধু পরিবারের বাকি সদস্যদেরকে ধানমন্ডির একটি বাসাতে (খুব সম্ভব ১৯ নম্বর রোড) বন্দি করা হয়। যেখানে তাঁরা পুরো স্বাধীনতার যুদ্ধের ৯ মাস বন্দি অবস্থায় ছিলেন। আমরা সাধারণ মানুষ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। তাঁর ব্যাপারে কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। ২৭ মার্চ কারফিউ কিছু সময়ের জন্য শিথিল করা হলে তখন গ্রিনরোড দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে হেঁটে চলেছি। রাস্তায় অনেক বিকৃত লাশ, শুধু মাথার খুলি পড়ে থাকতে দেখলাম। মানুষের ঢল নামল–সবাই যে যার মতো যেদিকে ইচ্ছা ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গেলাম। পিলখানায় যেতে পারলাম না, কারণ ভেতরে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে গিয়ে অসংখ্য লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম, জগন্নাথ হলের মাঠে লাইন করে দাঁড়ানো অবস্থায় হত্যাযজ্ঞের স্থান এবং অন্যান্য স্থানে মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম। নিজের মধ্যে কোনো কিছুই কাজ করছিল না, মাথার মধ্যে চিন্তাশক্তি একেবারেই শূন্যের কোঠায় নেমেছিল। এ অবস্থায় কোনো পরিচিত মুখেরও দেখা পেলাম না। আবার কারফিউ'র সময় আসন্ন বিধায় কলাবাগানের বাসায় ফিরে এলাম। ৩০ মার্চ মধ্যরাত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, হঠাৎ কলাপসিবল গেট ভাঙা এবং খোলার শব্দ–কিছুক্ষণের মধ্যেই আর্মির একটি দল ওপরে এসে আমাকে, আমার ছোট ভাইকে, বাড়িওয়ালার ছেলেকে তুলে নিয়ে নিউমার্কেটের কাছে টিচারর্স ট্রেনিং কলেজ ক্যাম্পে নিয়ে যায়, সেখানে থেকে বর্তমানে ধানমন্ডির সুলতানা কমপ্লেক্সে একটি ছোট কক্ষে নিয়ে রাখে। এই কক্ষটি একটি হত্যাকক্ষ ছিল যেখানে দেয়ালে বুলেটের গর্ত, মেঝেতে রক্ত ও প্রস্রাব ছিল। এই কক্ষেই ৪ অথবা ৫ এপ্রিল পর্যন্ত আমাদেরকে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে একদিন এই 'কনসেনট্রাসন' ক্যাম্প এর অধিনায়ক একজন কর্নেলের সামনে আমাকে উপস্থিত করা হলো। সে একটি রকিং চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "What do you do?" আমার উত্তর ছিল "I am an M.Sc student of Dhaka University." বলার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, "O, you are Dhaka University Student!! Where is your DUCSU Leaders ?" আমি যতই বলছি- "I don't know." সে ততই ক্ষিপ্ত হচ্ছিল এবং এক পর্যায়ে বলে উঠল, "I am giving you 24 hours time. You will have to find out your DUCSU leaders. If you fail to find out them, you will have to sacrifice your last blood for the sake of Bangladesh." আমাকে নিয়ে আসা হলো সেই নারকীয় কক্ষে। রাত দশটায় যাওয়া হলো কমান্ডো একজন অফিসারের কাছে। জানলাম তিনি আর্মি ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন মেজর এবং বাঙালি। আমাকে তিনি বলেন যেন আমি ডাকসুর চারজন নেতার ঠিকানা ও অবস্থান জেনে তাদের ধরিয়ে দিই। আমি তাকে বললাম, "আপনি তো বাঙালি, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন মেজর নিশ্চয় আপনার কাছে 'ইনটেলিজেন্স' রিপোর্ট আছে। আপনার পক্ষে তাদের ধরাটা কি সহজ নয়?" উত্তরে মেজর সাহেব আমাকে বলেন, "হ্যাঁ, আমি তো কর্নেলকে বলেছি, কিন্তু সে কিছুতেই মানছে না এবং আপনাকে (অর্থাৎ আমাকে) মেরে ফেলার অর্ডার দিয়ে দিয়েছে।" প্রকৃত, এইসব কথা শোনার পর আমার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। আমার কোনো অনুভূতি কাজ করছিল না। যে ক্যাপ্টেন আমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার ওপর নির্দেশ এলো আমাদেরকে মেরে ফেলার। মাঝ রাতে ৪ বা ৫ এপ্রিল আমাদেরকে বের করে আবার টিচার্স ট্রেনিং কলেজ নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে শেষ রাতের দিকে আমাদের বের করে কলাবাগান লেকের পাশে মিরপুর রোডে বেশ কিছুটা দূরে নামানো হলো। সেই ক্যাপ্টেন আমাদের ঢাকা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে বলে এবং আমাদের দিকে ফাঁকা গুলি করে। সে ফিরে যায়। কিছুক্ষণ পরে তার চলে যাওয়ার দিক থেকে আরও বেশ কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ আমরা শুনতে পাই, কে এই ক্যাপ্টেন, যে আমাদেরকে গুলি না করে ছেড়ে দিল আজও তা আমার কাছে রহস্য। পুরো ১৯৭১ সাল জুড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ হলো, ১৬ ডিসেম্বর চোখের সামনে লাইন ধরে পরাজিত প্রায় ৮০,০০০ পাকিস্তানি সেনাকে আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিতে দেখলাম রমনা রেসকোর্সে। যেখানে জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পন করে, সেখানেই ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন হলো এবং বিশাল জনসমুদ্র এই মহানায়ককে বরণ করে নিল। আমি শাহবাগে এখনকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের (সেই সময়ে শাহবাগ হোটেল ছিল) ছাদের কার্নিসে দাঁড়িয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করেছিলাম এবং এই মহানায়কের দিকে পলক না পড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম।

অধ্যাপক ড. আফতাব আলম খান
বিভাগীয় প্রধান, ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

মন মুকুরে বঙ্গবন্ধু: স্মৃতিতে অম্লান

এ এম কামরুল হক

একক জাতি হিসেবে বাঙালি জাতির জন্ম বঙ্গবন্ধুর কথায়, ভাষণে, পোশাক ও ভূষণে। বঙ্গবন্ধুকে দেখা এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার মতো সৌভাগ্যবানদের তালিকায় আমার স্থান হয়নি। প্রজন্ম ব্যবধানে বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান থেকে দূরে এক নিভৃত পল্লীতে অখ্যাত এক ঘরে জন্মগ্রহণকারী এই আমার জন্য তেমনটি সৌভাগ্যবান হওয়া শুধু স্বপ্নেই সম্ভব। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে আমার বাবা ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়েছিলেন। সেই সুবাদে তিনি বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে এসেছিলেন কিনা তা জিজ্ঞেস করার মতো বড় হওয়ার আগেই তাঁকে হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু ১৯৭১-এর ১ মার্চে তাঁর নিজের লেখা ডায়েরিতে শেখ মুজিবের ঘোষণার অনুক্রমিকায় ইস্ট পাকিস্তান কেটে দিয়ে বাংলাদেশ লেখাটা অনেক কিছুই নির্দেশ করে বৈকি? তিনি লিখেছিলেন, "Sheikh Mujibur Rahman orders complete Hartal in Dacca on 2/3/71 and from 3/3/71 Hartal throughout Bangladesh upto Saturday." এখন বুঝি বাক্যটা লেখার সময়ই বাবা অনুধাবন করেছিলেন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামের সাথে পশ্চিম পাকিস্তান নামের প্রদেশটা নিতান্তই বেমানান। এ নিয়ে সেই মফঃস্বল অঞ্চলে হৈচৈ তো হয়েছে বটেই, অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে ছাপোষা সেই কর্মজীবী ও তাঁর পরিবারকে। আজ যখন দেখি বাবার মুক্তিযোদ্ধা সনদে ভূষিত প্রায় অর্ধশত ছাত্র তার স্তুতি করছে তখন গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে বৈকি। গত ৭ জুন ২০১৯ আমার সৌভাগ্য হলো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রদের নিয়ে তাঁর কবর জিয়ারত এবং আলোচনা সভায় অংশ নেওয়ার। তাদের আবেগ বিহ্বল আলোচনা আমাদের চলার পথে অসীম শক্তি জোগাবে বটে। ১৯৭১-এর উত্তাল দিনগুলোতে বাবাকে রাত ছাড়া বাসায় দেখতাম না। পাশের বাজারে কোথাও আড্ডা দিতেও খুব একটা দেখিনি। তাহলে কোথায় থাকতেন তিনি–এ প্রশ্নটা আমার মনে উঁকি দিয়েছে অনেকবার। এই তো সেদিন তাঁর ছাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ওসমান ভাইয়ের কাছে উত্তরটা পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, বাবা ছাত্রদের দেখাশোনা করতে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। এখানে তিনটা বিষয় প্রতিপাদ্য। প্রথমত, বাবা ১ মার্চ ১৯৭১-এ তার ডায়েরিতে বঙ্গবন্ধুর আদেশের কথা লিখতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান কেটে বাংলাদেশ লিখলেন; দ্বিতীয়ত, তিনি ছাত্রদের দেখভাল করতে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন এবং তৃতীয়ত বাবার অর্ধশতাধিক ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে গেলেন। এর অর্থ বাবা কোনো এক অদৃশ্য আদেশ পালনেই তাঁর ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টির মানষে গ্রাম গ্রামান্তর ঘুরে বেড়াতেন। কার অদৃশ্য আদেশ পালনে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন সেটা আর বলার অপেক্ষা থাকে না। সেই আদেশদাতাই শেখ মুজিব, তিনিই বঙ্গবন্ধু।

সেই সময়ে দিনক্ষণ মনে রাখার মতো বয়স বা শিক্ষা কোনোটাই আমার ছিল না। তবে এটুকু বুঝি, মফঃস্বল হলেও হাজারো ছাত্র অধ্যুষিত একটা স্কুল আর পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র দুধের মিল থাকায় লাহিড়ী মোহনপুর অন্যান্য এলাকার তুলনায় রাজনীতিতে একটু বেশিই তৎপর ছিল। বিপ্লবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর পৈতৃক আবাস লাহিড়ী মোহনপুরের বাসিন্দাদের মধ্যেকার স্বভাবসিদ্ধ বৈপ্লবিক চেতনাও এর অনুঘটক ছিল বলে ঠাওর করা যায়।

তৎকালীন লাহিড়ী মোহনপুরের সব ঘটনা প্রবাহ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে আবর্তিত হতো। দেশের একমাত্র দুগ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি এলাকার শিক্ষিত-আধা শিক্ষিত জনসাধারণের কাজের জোগানদাতা হিসেবে ছিল সমাদৃত। মিলটিকে ঘিরে একটা শিক্ষিত রুচিশীল সমাজ গড়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। তাদের মতো স্বচ্ছল জীবনমান লাভের আকাঙ্ক্ষা এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে অসম ভূমিকা রেখেছে বৈকি? পক্ষান্তরে ইউনিয়ন পরিষদকেন্দ্রিক রাজনীতির পাশাপাশি বিপ্লবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর পিতা বিদ্যানুরাগী ক্ষিতিশ মোহন লাহিড়ী প্রতিষ্ঠিত লাহিড়ী মোহনপুর ক্ষিতিশ মোহন (কে এম) ইনস্টিটিউশন এলাকার রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। ইউনিয়ন পরিষদ ছিল পুরানো ধ্যান-ধারণার গতানুগতিক পাকিস্তানপন্থি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। অপরদিকে স্কুলটি ছিল প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল ও বৈপ্লবিক রাজনীতির সুতিকাগার।

স্বভাবসিদ্ধভাবে ইউনিয়ন পরিষদের আইয়ুবের মৌলিক গণতান্ত্রিকগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর আস্থাশীল ছিল। অন্যদিকে, স্কুলের আওয়ামীপন্থি ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে এলাকার তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুরই অনুসরণে প্রথমত স্বায়ত্বশাসন এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৭০ নির্বাচনকালে তাঁদের মিছিল-সমাবেশে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের সুবিধাভোগী মুসলীম লীগের তাবেদারগণ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ভোটযুদ্ধের পরাজিত শক্তির এসব তাবেদারগণ ক্ষমতা হস্তান্তরের দীর্ঘসূত্রিতা এবং সেনা মোতায়েনে হালে পানি পেলেও তরুণ প্রজন্মের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে বেসামাল হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কোনো বিকল্প খুঁজে পায়নি। যার বহিঃপ্রকাশ দেখতে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি লাহিড়ী মোহনপুরবাসীদের। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের আহ্বানে সাড়া দিয়ে

স্বাধীনতা ও সমাজবিরোধীদের রুখে দিতে ছাত্র-তরুণদের সমন্বয়ে গঠিত 'যমদূত পার্টি'র কর্মকাণ্ডে জল ঢেলে দিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ে এসে নির্দোষ চাঁদ ও তারা ভাইকে পেটানো এবং মোহনপুরের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় হেলিকপ্টার যোগে সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ারকে এনে স্কুলের শহীদ মিনার ভাঙানো এবং হেডমাস্টার সাহেবকে শাসিয়ে নেওয়া প্রণিধানযোগ্য। এতে 'যমদূত পার্টি'র দৃশ্যমান কর্মকাণ্ড বন্ধ হলো বটে। কিন্তু মুজিব মন্ত্রে দীক্ষিত ছাত্র-যুবাদের মুক্তিযুদ্ধে গমন ঠেকাবে কার সাধ্য? মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সেই মৌন মিছিলে মুসলিম লীগের কর্তাব্যক্তিদের সন্তানরাও শামিল হলো। স্বাভাবিক কারণে রোষানোলে পড়লেন সেই প্রধান শিক্ষকের ওপর।

স্কুলে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং ১৯৬৬ তে ছয় দফার প্রবক্তা হিসেবে স্কুল কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ে প্রধান শিক্ষকের পদটি ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। এ দফায় তাঁর অকুতোভয় ছাত্রদের প্রতিবাদের মুখে কর্তৃপক্ষ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। এরপরও বেশ কয়েকবার তাকে স্কুল-ছাড়া করার প্রচেষ্টাকালে ছাত্ররা রক্ষাকবচের ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৭১ সালে রক্ষাকবচ ছাত্রদের অনুপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষক সাহেবের প্রাণটাই গেল। বঙ্গবন্ধুর আদেশের অনুক্রমিকায় তাঁর ডাইরীতে লেখা বাংলাদেশ আর দেখা হলো না।

এবার আমরা লাহিড়ী মোহনপুর পর্ব শেষ করে নাটোর জেলার আনন্দ নগর গ্রামে চলে গেলাম। লাহিড়ী মোহনপুরের তুলনায় আনন্দ নগর ছিল নিরুত্তাপ। চলনবিল বিধৌত আত্রাই-বড়াল-নন্দকুজা নদী পরিবেষ্টিত আনন্দ নগরে মাঝে মাঝে অসহায় মানুষ আর মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া এবং কয়েক দফা রাতে গোলাগুলির শব্দ শুনে কমান্ডো বাহিনীর মতো মাটিতে শুয়ে থাকার বাইরে তেমন কিছু একটা করতে হয়েছে বলে মনে নেই। সেই সুযোগে বন্দুকধারী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দুদণ্ড কাটাতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে হতো। মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত স্টেনগানটি ছুঁয়ে এক নিমিষে যুদ্ধ জয় করেছি কত।

মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নে তখন স্বাধীন বাংলার উদীয়মান পতাকা, মন মুকুরে বঙ্গবন্ধুর অমীয় বাণী–"রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ডিসেম্বর ১৯৭১ নাগাদ বঙ্গবন্ধুর সেই বজ্রবাণী বাস্তবে পরিণত হলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বার্তা মাঠে-প্রান্তরে ধ্বনিত হলো মানুষের 'জয় বাংলা' স্লোগানে আর মুক্তিযোদ্ধাদের মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে। আনন্দ নগরে তখন আনন্দের লহরী। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের তখন একটা মাত্র অভাব, বঙ্গবন্ধুর অভাব। গ্রাম-গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে একই আলোচনা, একই অপেক্ষা।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন স্বাধীন বাংলার মাটিতে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হলো আরেক মুক্তির সংগ্রাম, ক্ষুধামুক্তি, দারিদ্র্যমুক্তির সংগ্রাম, সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রাম। ছোট হলেও বুঝতে পারতাম সদ্যস্বাধীন দেশে শহরের গণ্ডি পেরিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এক নীরব বিপ্লবের ছোঁয়ায় এলাকার কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং স্বাস্থ্যসেবায় অভূতপূর্ব পরিবর্তনের জোয়ার প্রত্যক্ষ করলাম। প্রকৃতি নির্ভর আউশ-আমন ধান চাষের পরিবর্তে সমবায়ী ইরিগেশন চাষ শুরু হলো। নতুন নতুন কারিগরি ও কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলো। থানা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। এলাকায় ভূতাত্ত্বিক জরিপও করা হলো।

মহসিন ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে আনন্দ নগর গ্রামের আহমেদ ভাইকে দিয়ে শুরু করে আসাদ ভাই, নুরুন্নাহার আপারা ধারাবাহিকভাবে জাপান গেলেন। সেই সুবাদে আনন্দ নগর কৃষি বিশেষজ্ঞের গ্রামে পরিণত হয়ে গেল। জাপানিদের আনন্দ নগর গ্রামে অবস্থানের সুবাদে আমার ভাঙা ভাঙা ইংরেজি জ্ঞানের একটা গতি তো হলোই, সাথে সাথে গ্রামের লোকজনের মুখে মুখে তখন আমার জাপান যাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ধ্বনিত হতে থাকল। আমিও জাপান যাওয়ার দশ বছরের অগ্রিম মানসিক প্রস্তুতি শুরু করলাম।

বঙ্গবন্ধুর স্বনির্ভর বাংলাদেশ রূপকল্পের অংশ হিসেবে আনন্দ নগরকে স্বনির্ভর গ্রামে রূপান্তরের কিছু কাজ আমার দাদা তরিক পণ্ডিত আগেই করে রেখেছিলেন। গ্রামে তিনঘর কলু পরিবার থাকলেও কোনো তাঁতি পরিবার ছিল না। কাজেই তিনি একটা তাঁতি পরিবারকে অনেক আগেই গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন। এবারে তিনি কাজে লেগে পড়লেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাড়ার নান্নু ভাইদের পরিবার তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠা করে উৎপাদন বিপণন শুরু করল। অন্যদিকে কলু পাড়ায়ও উন্নয়নের হাওয়া লাগল। আব্বাস সাহার আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেল।

দাদা তরিক পণ্ডিত একদিন ডেকে আমাকে নতুন স্লোগান শিখিয়ে দিলেন, "এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ"। তিনি বললেন বঙ্গবন্ধুর জন্ম

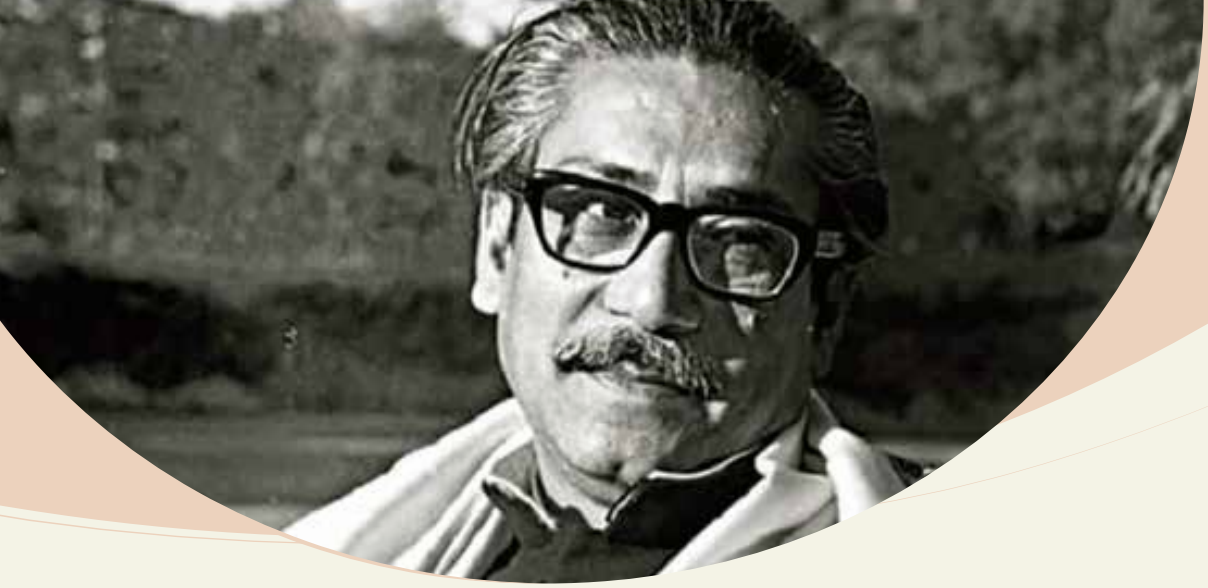

না হলে বাংলাদেশ তো হতো না, আমার জাপানে যাওয়ার স্বপ্নটাও দেখা হতো না। কিন্তু আমার সে স্বপ্ন আর বেশিদূর এগোয়নি। ১৯৭৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর সাথে সাথে ধারাবাহিকভাবে জাপান গমন বন্ধ হয়ে গেল। এলাকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন মুখ থুবরে পড়ল। হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দীর ভাবশিষ্য ও আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের একান্ত সহচর আমার দাদা তরিক পণ্ডিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিও একনিষ্ঠ। তিনি ১৯৭৫ এর শেষার্ধে পক্ষঘাতগ্রস্ত হয়ে অর্ধ বিকলাঙ্গ হলেন, তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

পিতৃহীন এক বালকের শেষ অভিভাবকও নিশ্চল বাকরুদ্ধ হলে তার প্রমাদ গোণা ছাড়া তার কোনো উপায় রইল না। এর পর মাস গড়িয়ে বছর পেরোতে থাকল, চলনবিলের পানিতে প্রতিবছর আনন্দ নগর গ্রাম বিধৌত হলো, কিন্তু ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে মুখ থুবরে পড়া বিপ্লব আলোর মুখ দেখতে পেলো আরও অনেক বছর। আমরাও জীবিকার অন্বেষায় ছড়িয়ে পড়লাম শহরে-বন্দরে দেশ দেশান্তরে।

গত কয়েক বছরে আনন্দ নগরের অনেক উন্নতি হয়েছে। পাকা রাস্তা হয়েছে, ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে একটা কারিগরি কলেজ হয়েছে। আনন্দ নগরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে উপজেলা মসজিদ কমপ্লেক্স এবং স্টেডিয়াম। আনন্দ নগর আবার আনন্দে বিভোর। আনন্দ নগরের প্রতিষ্ঠানগুলো বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্নের একটা অংশ, যা বাস্তবায়িত হচ্ছে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে সাংসদ আব্দুল কুদ্দুছ আনন্দ নগরের এসব উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন। ১৯২০ এর দশকের শিক্ষিত আমার দাদা গ্রামেই থাকতেন, গ্রাম নিয়েই ছিল তাঁর যত স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের একটা ছোট অংশ ছিল তাঁরও স্বপ্ন। গ্রামের এতসব ইতিবাচক পরিবর্তনে দাদার উত্তরাধিকারী হিসেবে আমার আবেগে বিহ্বল হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমার দাদার পক্ষ থেকে ও আনন্দ নগরবাসীর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও সালাম। শেখ হাসিনার হাত ধরে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে গ্রাম এগিয়ে যাচ্ছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তারপরও আমার মাঝে এক অসীম শূন্যতা। কেন? সে উত্তর দিয়েই শেষ করব।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সমসাময়িককালে আমি নব্য স্কুলপড়ুয়া ৫-৬ বছরের এক দুরন্ত শিশু। বয়সটা আসলেই আমার সাথে দুশমনি করেছে, যুদ্ধে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। কিছু ঘটনার সাক্ষী হওয়া আর মিছিলে শামিল হয়ে 'জয় বাংলা', 'পাকিস্তান নিপাত যাক', 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো', 'আয়ুব-মোনায়েম দুই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই', 'ঢাল নাই তলোয়ার নাই, নিধিরাম সরদার' এসব স্লোগান দেওয়ার বাইরে কোনো কিছু করা ছিল আমার সাধ্যাতীত। এসব মিছিলে অংশ নিয়ে হাঁটতে না পারার দোষে আমার সতীর্থরা যখন বাদ পড়ে যেত, আমি হেডমাস্টারের ছেলে হওয়ার সুবাদে কারও না কারও কোলে সওয়ার হয়ে রীতিমতো বিপ্লবী মূর্তি ধারণ করতাম। পরের দিনের মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে স্লোগান মুখস্ত করে ঘরের মধ্যেই মহড়া দিতাম। বাবার উৎসাহে আমার বিপ্লবী মন একদিন মঞ্চ মাতানোর স্বপ্ন দেখত। আমার মতো বালকের কাছে তখন লাহিড়ী মোহনপুরের কলেজপড়ুয়া লতিফ ভাই (পরবর্তীতে সাংসদ), টিপু ভাই, হামিদ ভাই, কিসমত ভাই বড় বড় নেতা। তাঁদের কথা থেকে মুজিব ভাইকে চিনতে শিখেছি। তখনও বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার পরিচয় ঘটেনি। কিন্তু তাঁর অমীয় বাণী অন্তঃস্থ করেছি। সে দিনগুলোর ঘটনা এখনও আমার স্মৃতিতে অম্লান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে গত দশকে বাংলাদেশের গর্ব করার মতো অর্জন শুধু মনে করিয়ে দেয়, তিনি থাকলে উন্নয়নের আজকের এই মঞ্চে তো আমরা কবেই পৌঁছে যেতাম। বঙ্গবন্ধুর শূন্যস্থান পূরণ করেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ একদিন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিণত হবেই। কিন্তু তারপরেও সব কিছু ছাপিয়ে হৃদয় কোটরে বঙ্গবন্ধুকে না দেখা এবং তাঁর সান্নিধ্যে না আসতে পারার অতৃপ্তি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে কাল-কালান্তর।

কমডোর এ এম কামরুল হক, (এনডি), এনজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন
ট্রেজারার
বিএসএমআরএমইউ

বঙ্গবন্ধুঃ
চির উদ্ভাসিত চেতনা

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন

আলতাফ হোসেন
ওয়াহিদুল শেখ

নক্ষত্রের জন্ম যেমন এক আজন্ম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হয়, তেমনই আমাদের বঙ্গবন্ধুও নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই 'বঙ্গবন্ধু' হয়েছিলেন। তিনি এমনি এমনি বঙ্গবন্ধু হয়ে যাননি। নানা নির্যাতন, নিপীড়ন এবং সংগ্রাম সহ্যের পরই তিনি আমাদের বঙ্গবন্ধু হতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ তথা বিশ্বের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যার আলোয় আলোকিত হয়েছে এই বাংলা, যার আলোয় আলোকিত হয়েছি আমরা।

ব্যক্তিজীবনে তিনি সকলের কাছে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি পেলেও তিনি ছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতির অনন্য নিদর্শন। উচ্চতর শিক্ষাজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের মতো স্বনামধন্য এক বিভাগের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে যার মন সব সময় আনচান করত, তাঁর সেই সময় উচ্চতর শিক্ষা সম্পন্ন করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি বাঙালির তথা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য যা করে গেছেন সেটা এক কথায় অতুলনীয়।

যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক শিক্ষার স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে শিক্ষা-চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন ভাববাদ, প্রয়োগবাদ বা বস্তুবাদের গতিতে আবদ্ধ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাতত্ত্ব মানবতাবাদ বা মানুষের মুক্তির ইতিহাস। বিশেষ করে বাঙালি জাতির মুক্তি ও বিশ্বে বাঙালির মাথা উঁচু করে নেতৃত্ব দেওয়ার দর্শন। বাংলার মানুষ নিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর পাঠশালা। লোকায়ত বাঙালি সমাজের মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণা পরিপুষ্ট করেছে তাঁর কর্ম, কথা, আচরণ ও দর্শনকে। শিক্ষার লক্ষ্য ও স্বপ্নকে বঙ্গবন্ধু আত্মার সন্তান হিসেবে লালন করেছিলেন। তাই ১৯৫২ সালে ভাষার ওপর আঘাত এলে তিনি প্রতিবাদী হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলা ভাষার বিলয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে শিক্ষাব্যবস্থা, বোবাপুরীতে পরিণত হবে সমগ্র বাংলা। ব্রিটিশদের পশ্চিমা শিক্ষাতত্ত্ব, পাকিস্তানিদের শিক্ষা কমিশন ষড়যন্ত্র আর প্রচলিত মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন বাঙালির মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর এক মৌলিক শিক্ষাদর্শন।

বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখেননি, তিনি একটি উন্নত-সমৃদ্ধ সুখী বাংলাদেশ, তাঁর কথায়, 'সোনার বাংলা'র স্বপ্নও দেখেছিলেন। তিনি বলতেন, "সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।" অর্থাৎ দক্ষ, যোগ্য, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক, আধুনিক, শিক্ষিত সন্তান বা মানবসম্পদ। আর তা সৃষ্টির জন্য থাকা চাই সত্যিকার মানুষ গড়ার শিক্ষা বা সুশিক্ষা। এরই নিদর্শনস্বরূপ ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নেরর উদ্যোগ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালের সংবিধানে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' অংশেই শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার ওপর বঙ্গবন্ধু যে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন তার প্রমাণ মেলে বাংলাদেশের প্রথম বাজেটে। সে বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে তিন কোটি ৭২ লাখ টাকা বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডন্যান্স ঘোষণা করা হয়েছিল, যার মূল কথা–বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদাকে সভাপতি করে বঙ্গবন্ধু গঠন করেছিলেন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন। কমিশন শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি ও গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে শূন্য কোষাগার নিয়েও বঙ্গবন্ধু দেশের সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছিলেন। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, আগামী প্রজন্মের ভাগ্য শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করে। শিশুদের যথাযথ শিক্ষার ব্যত্যয় ঘটলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হবে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মাঝে বিনামূল্যে বই, খাতা, পেন্সিল, দুধ, ছাতু, বিস্কুট বিতরণ করা হতো।

বঙ্গবন্ধু নিয়মিত পড়াশোনা করতেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পেছনে ছিল গভীর অধ্যয়ন, জানা-চেনা-শোনা ও দেখার গভীর অন্তর্দৃষ্টি। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারের উজ্জ্বল সংগ্রহের কথা অনেকেই জানতেন। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমলা নয়, মানুষ সৃষ্টি করুন।" ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্য সম্মেলনের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "একটি সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিল্প, যোগাযোগব্যবস্থা বা অন্য সব ক্ষেত্রে যেমন উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। আমি সর্বত্রই একটি কথা বলি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার মানুষ আকাশ থেকে আসবে না, মাটি থেকেও গজাবে না। এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্য থেকেই তাদের সৃষ্টি করতে হবে।"

একই বছর বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নারীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেন, "শতকরা বিশজন শিক্ষিতের দেশে নারীর সংখ্যা আরও নগণ্য। শুধু ক, খ শিখলেই শিক্ষিত হয় না, সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্ত হইতে হইবে।"

বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম, চিন্তা, চেতনা, দর্শন ও মানস গঠনে বিভিন্ন শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও প্রভাব রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিজীবন চর্চায়ও শিক্ষক, কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের শ্রমিক নেতা জহুর আহমেদের আচরণে এক শিক্ষক অপমান বোধ করলে বঙ্গবন্ধু নিজে ওই শিক্ষকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। অবরুদ্ধ শিক্ষকদের মুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত (বর্তমান গণভবন) মন্ত্রিসভার জরুরি সভা বাদ দিয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভাকক্ষে। স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নের পরিকল্পনায়ও তিনি শিক্ষকদের যুক্ত করেছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনে ড. নূরুল ইসলাম, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর আনিসুর রহমান, ড. মোশাররফ হোসেনসহ অসংখ্য শিক্ষক, প্রকৌশলী ও পেশাজীবীকে জড়ো করেছিলেন। প্রফেসর কবীর চৌধুরী ও ড. এ আর মলিকে মন্ত্রিসভায় নিয়েছিলেন। সাহিত্যিক আবুল ফজলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। জয়নুল আবেদিন সহ সকল শিল্পী ও শিক্ষাবিদকে তিনি শিক্ষকতুল্য সম্মান করতেন এবং উপদেশ শুনতেন।

নক্ষত্রেরাও মারা যায়। নক্ষত্রেরও মৃত্যু হয়। কিন্তু সেটা হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। আর আমাদের নক্ষত্রের মৃত্যু হয়েছিল কিছু স্বার্থলোভী দেশদ্রোহী, বিপথগামী সেনাসদস্যের কারণে। যারা কিনা এই জাতিকে করে দিয়েছিল অভিভাবক শূন্য।

একটি জাতি বা রাষ্ট্রের শিক্ষাদর্শন নির্ভর করে সে রাষ্ট্র বা জাতির শাসক বা জনকের নীতি-আদর্শের ওপর। রাষ্ট্রের পথপ্রদর্শক বা জাতির নায়ক যত বেশি গুণের অধিকারী হন, সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা তত বেশি উন্নত হয়। আর তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তির জনক তথা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল ঘাতকের কারণে আমরা হারাই আমাদের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে। আমরা হারাই আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে। কিন্তু প্রত্যেক নক্ষত্রের মৃত্যুর পর যেমন মহাবিশ্বে কিছু না কিছু রেখে যায়, তেমনি আমাদের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র যিনি, তিনিও আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরিকে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের অন্যতম বুদ্ধিভিত্তিক শাসক যা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের আলোকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও সমুন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "শিক্ষাকে আমি খরচ মনে করি না; আমি মনে করি এটি একটি বিনিয়োগ, জাতিকে গড়ে তোলার বিনিয়োগ।" ঐতিহাসিক সমুদ্রজয়ের কারিগর শিক্ষামন্ত্রী ডা. দিপু মনিও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব। দেশীয় শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নত করতে তাঁর বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন-সংস্কারের পদক্ষেপও দৃষ্টিগাহ্য হচ্ছে।

নক্ষত্রের মৃত্যুর পরও যেমন মহাবিশ্বে কিছু না কিছু রেখে যায়, তেমনি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতিটা স্তরেই রেখে গেছেন কালোত্তীর্ণ মুক্তিদর্শনের পথ।

অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন
একাডেমিক উপদেষ্টা, বিএসএমআরএমইউ

ওয়াহিদুল শেখ
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মানবিক বঙ্গবন্ধু

এ জেড এম জালাল উদ্দিন

"এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।"

—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অপ্রকৃতিস্থতার বিরুদ্ধে প্রকৃতিস্থতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে বিজয়-যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কিংবদন্তি মহাপুরুষের হাতে অর্জিত হয়েছে, ইতিহাসের সেই প্রবাদপুরুষ, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাহেন্দ্রক্ষণ আজ। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে সর্বদা এক মহামহিমাময় অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

একজন শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে শুধু মাতৃক্রোড়েই জন্মগ্রহণ করে না, বরং একটি দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি সর্বোপরি একটি জাতির কোলেও জন্মগ্রহণ করে। এ জন্য শুধু মাতা-পিতা কিংবা বংশের পরিচয়ই এই শিশুটির সব পরিচয় নয়। বরং দেশ, সমাজ ও জাতিগত পরিচয়ই তার বৃহত্তর পরিচয়। আমাদের দেশ ও সমাজে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ এমনই একজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি জাতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আপন যোগ্যতায় হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, চেতনার অগ্র-মশাল, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে একজন মহামানবের আবির্ভাব কামনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেই ব্যক্তি যিনি মহামানবের সংজ্ঞা ধারণ করেই জাতির মাহেন্দ্রক্ষণে নদীমেখলা এ বাংলার মাটি স্পর্শ করেছিলেন। যে মাটি ছিল উপেক্ষিত এবং যে মাটির মানুষ ছিল শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত। বঙ্গবন্ধু বাঙালির দুঃখ-কষ্টকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ভারত নিবাসী প্রখ্যাত গবেষক ড. সিরিয়াক মাপরিয়াল তাঁর এক গবেষণাকর্মে বলেছেন, "ভারতীয় হিসেবে আমরা গর্বিত যে, আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়েছিল, আর বাঙালি হিসেবে তোমাদের গর্ব যে, তোমাদের দেশে বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল।" বঙ্গবন্ধু ছিলেন শোষিত মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল-"বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্ত। শোষক ও শোষিত; আমি শোষিতের পক্ষে।" বঙ্গবন্ধুর এই উক্তিটি শোষকের প্রতি ছিল এক ধরনের সাবধান বার্তা। শোষিত-বঞ্চিত ও নির্যাতিত-দুঃখী মানুষের পক্ষে ছিল বঙ্গবন্ধুর পরিষ্কার অবস্থান। পঞ্চান্ন বছরের ক্ষুদ্র জীবনে বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড ও একটি জাতির দীর্ঘ বঞ্চনা ঘুঁচিয়ে এই ধরণীর বুকে স্থাপন করেছেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি রয়েছেন তুলির আঁচড়ে, বঙ্গ-প্রান্তরে, গান ও কবিতার ছন্দে। "ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে চিরকাল, গান হয়ে/নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা; যাঁর নামের ওপর/কখনও ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া/ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পাখা মেলে দেয় জ্যোৎস্নার সারস/ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো/দুলতে থাকে স্বাধীনতা/ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর ঝরে/মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।" 'ধন্য সেই পুরুষ' কবিতায় বাঙালির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধুর বিশালতাকে এভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন আমাদের প্রয়াত কবি শামসুর রাহমান। কবিতার শিরোনাম ও কবির নিপুণ বর্ণনা সহজেই বুঝিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধু সত্যিকার অর্থেই একজন প্রবাদপুরুষ। গণমানুষের এই মহান নেতা লেখনী কিংবা বক্তব্যে তুলে ধরেছেন শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি তাঁর নিরন্তর ভাবনার কথা। ১৯৭৩ সালের ৩০ মে বঙ্গবন্ধু ডায়েরির পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়ে আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তা-ই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এ নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি ও অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।" দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে এক জনসভায় তিনি বলেন, "আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে-খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক।" মহানুভবতায় পূর্ণ মানবব্রতী বঙ্গবন্ধুর নামের পাশে যুক্ত হয়েছে নানা অভিধা। আমেরিকার বিখ্যাত সাময়িকী 'নিউজ উইক' বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' আর লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা তাঁকে বাংলার 'মুকুটহীন সম্রাট' বলে আখ্যায়িত করেছে। দার্শনিক নিৎসে রাষ্ট্র গঠনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক কর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র গঠনের এই মহৎ কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন বলেই আমরা বলি তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং বাঙালি জাতির পিতা।

শেখ মুজিব এক মহাজীবনের নাম। জমিদার কিংবা প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম না নিয়েও ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন সাধারণ মানুষ কালের পরিক্রমায় এক অনন্য-অসাধারণ জননায়ক হয়ে উঠতে পারেন, তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কেবল শেখ মুজিব। কুঁড়ি থেকে পাপড়ি মেলে পুষ্পিত হওয়ার মতোই তিনি 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির পিতা'য় রূপান্তরিত হলেন। শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তিনি রাজনীতি করেননি, তিনি রাজনীতি করেছেন এই জনপদের মানুষের মুক্তির জন্য। সাহসী ও সংগ্রামী জননায়ক হিসেবে তিনি মুক্তির সন্ধান করেছিলেন 'সর্বজনের মনের মাঝে-দুঃখ-বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে'। তাই আমৃত্যু কঠিন-কঠোর জীবন-তপস্যার মধ্য দিয়ে তিনি এ ভূখণ্ডের জনমানুষকে দেখাতে চেয়েছিলেন সত্যের পথ, মুক্তির পথ এবং বেঁচে থাকার পথ। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে অজস্র দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে, মৃত্যুকে বারবার পরাস্ত করে তিনি তাঁর স্বপ্নকে জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হন, প্রতিষ্ঠা করেন স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নামের একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র, তিনি হয়ে ওঠেন জাতির জনক। ইতিহাস যেমন নায়ক সৃষ্টি করে, তেমনি নায়কও ইতিহাস সৃষ্টি করেন। বঙ্গবন্ধু তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এই জায়গায় পৌঁছবার জন্য তাঁর প্রস্তুতি শুরু হয় দীর্ঘকাল আগে থেকে। নানা গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত প্রগতিশীলতার পথে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়। নিপীড়িত ও বঞ্চিতের জন্য দুঃখবোধ করা, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদী ভূমিকা নেওয়া, নিজের স্বার্থের কথা না ভাবা–শেখ মুজিবের চরিত্রের এইসব গুণাবলি তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনে ছাত্রাবস্থায় এমনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৯ সালে তিনি যখন গোপালগঞ্জ স্কুলের ছাত্র তখন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একবার গোপালগঞ্জে গিয়েছিলেন। তাঁদের সেখানে একটি জনসভায় বক্তৃতাদানের কর্মসূচি একটি মহল পণ্ড করার উদ্যোগ নিলে কিশোর শেখ মুজিব তীব্র প্রতিবাদী অবস্থান নেন, যার পরিণামে তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। সেই তাঁর প্রথম কারাবাস। সেটা ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজত্বের কাল। তারপর ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে নয়া-ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ন্যায় ও সত্যের পক্ষে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণের জন্য তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিম্নের ঘটনাটি থেকে।

• ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানের জন্য তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন এই শাস্তি পান। ভবিষ্যতে সুবোধ আচরণের মুচলেকা দিয়ে অন্যান্যরা এই শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করলেও শেখ মুজিব ভিন্ন ধাতুতে গড়া ছিলেন বলেই তা করতে পারেননি। তিনি অলিখিত মুচলেকা দিয়েছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী আপোশহীন সংগ্রামের কাছে এবং সে-অঙ্গীকার তিনি কখনো ভঙ্গ করেননি। আইন বিভাগে তাঁর ছাত্রপদ বাতিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বহিষ্কার প্রসঙ্গে তিনি ঈষৎ কৌতুক ও ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন, "একদিক থেকে এটা ভালোই হলো, এখন থেকে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সময় প্রত্যেকবারই পেনাল কোডের কোন ধারা আমি ভঙ্গ করছি তা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে না।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের এই আন্দোলনের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবি শামসুর রাহমান তাঁর একটি লেখায় লিখেছেন, "শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা কিছু সংখ্যক সাধারণ ছাত্র তখন ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবন ঘেরাও করেছিলাম... ভাইস-চ্যান্সেলরের সবুজ পাতাওয়ালা ছোট ছোট গাছের বেড়া ঘেরা বাসভবনের সামনে, মনে পড়ে, দশাসই ঘোড়সওয়ার পুলিশের তাড়া খেয়েছিলাম। একটি বলবান অশ্বের খুরের ঠোকর আর পুলিশের ব্যাটের বাড়ি খেতে খেতে বেঁচে যাই কোনোমতে। দীর্ঘকায় কান্তিমান শেখ মুজিব তাঁর কথা এবং জ্বলজ্বলে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করছিলেন, জোগাচ্ছিলেন সাহস। সেদিন ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে থেঁতলে গেলেও হয়তো কোনো খেদ থাকত না। প্রকৃত নেতার প্রেরণার শক্তি বোধহয় এই রকমই হয়।"

শেখ মুজিব হঠাৎ করে না, ধাপে ধাপে বিভিন্ন সময়ে সাহস ও প্রজ্ঞার সঙ্গে নানান সংকটের সার্থক সমাধান করে। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তাঁর বজ্রকঠোর সংকল্প, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের বিবিধ গুণাবলি দ্বারা দেশের আপামর জনসাধারণের অপার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জন করেন। এভাবেই একসময় তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার বন্ধু, বঙ্গবন্ধু, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণাদাতা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনন্য প্রতীক পুরুষ। তাঁর লক্ষ্য ছিল শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলতেন কোথাও কোথাও মেকি গণতন্ত্র শোষকের স্বার্থরক্ষার কাজ করে, কিন্তু সে রকম গণতন্ত্র বাংলাদেশ চায় না। শোষিতের গণতন্ত্র বলতে তিনি সেই গণতন্ত্র বোঝাতে চেয়েছিলেন, যা দুঃখী-দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষকে রক্ষা করবে, শোষকদের নয়। সংসদের স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "...আমাদের গণতন্ত্রের সাথে অন্যের পার্থক্য আছে... আমরা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না, কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয় সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই।" বঙ্গবন্ধুর জীবনবোধ ও সমাজবোধের পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর বক্তৃতা থেকে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে তিনি 'অন্ধকার হতে আলোর পথে যাত্রা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, "নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা, বাংলার মানুষ হাসবে, বাংলার মানুষ খেলবে, বাংলার মানুষ মুক্ত হয়ে বাস করবে, বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত খাবে–এই আমার সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য। আমি যেন এই কথা চিন্তা করেই মরতে পারি–এই আশীর্বাদ, এই দোয়া আপনারা আমাকে করবেন।" উক্ত বক্তৃতায় তিনি আরও বললেন, "আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, আমি মানুষ।" এ তিনের মধ্যে সংঘাত তিনি দেখেননি, খুঁজে পেয়েছেন মিলন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। ভালো মানুষ না হলে কেউ ভালো মুসলমান হতে পারে না। একজন ভালো মানুষ দেশপ্রেমিক হবে, তাই বাঙালি পরিচয় দিতে বুক ভরে যায়। তাঁর এই আত্মপরিচয়ের ঘোষণা সকল সংকীর্ণতা পেরিয়ে তাঁকে পৌঁছে দেয় উদারতা ও মানবতার শিখরে। ইতিহাসের এই বরপুত্রের 'চোখে ধরা পড়েছিল রূপসী বাংলার স্নিগ্ধ মুখশ্রী,/তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল 'আমার সোনার বাংলা',/তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল মুক্তি-স্বপ্ন প্রিয়/স্বাধীনতা' (নির্মলেন্দু গুণ, 'পুনশ্চ মুজিবকথা')। আর সে কারণেই বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিচ্ছেদ্য এক সত্তা। একাত্তরে তাঁর ৫২তম জন্মদিনে বিদেশি সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, "আমি জীবনে কখনও আমার জন্মদিন পালন করিনি। আপনারা আমার দেশের মানুষের অবস্থা জানেন, তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা, তখনও তারা মরে। আমার আবার জন্মদিন কি, মৃত্যুদিবসই-বা কি? আমার জীবনই-বা কি? মৃত্যুদিন আর জন্মদিন অতিগৌণভাবে এখানে অতিবাহিত হয়। আমার জনগণই আমার জীবন।" জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির চিন্তাই ছিল তাঁর একমাত্র আরাধ্য। ধীরে ধীরে তাই বাঙালির সকল চাওয়া-পাওয়ার এক মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। একই সঙ্গে আবার বিশ্বের সকল মানবিক উদ্বেগ তাঁর ভেতর ঠাঁই করে নিয়েছিল। সেই অর্থে তিনি ছিলেন স্বভূমিতে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এক আধুনিক মানুষ। তাই ৩০ মে ১৯৭৩-এর ডায়েরিতে তিনি লিখেছিলেন যে এই দুই ভাবনা তাঁর রাজনীতি ও অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে। "As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bangalee, I am deeply involved in all that concerns Bangalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being.

কথায় বলে, উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়। অন্তত কিছু ঘটনা ভবিষ্যতের বঙ্গবন্ধুর জাতির জনক হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ইঙ্গিতবহ। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব জেনেই আজীবন-সংগ্রামী বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আশা করি বিন্দুতেই সিন্ধুর পরিচয় মিলবে।

- ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩৮ সালে। বঙ্গবন্ধু তখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। স্কুল পরিদর্শনে এলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। সাথে ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুল পরিদর্শন শেষে তাঁরা ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাত্র নিয়ে তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ালেন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান। সবাই বিস্মিত, এবং কিছুটা বিব্রতও। কেন তিনি এই দুজন বিশাল ব্যক্তিত্বের পথ আটকালেন? কোনো দ্বিধা বা জড়তা ছাড়াই তিনি দাবি করলেন যে, স্কুল ছাত্রাবাস মেরামতের ব্যবস্থা না করে মন্ত্রী দু'জন যেতে পারবেন না। কিশোরের সাহস দেখে বিমুগ্ধ শেরে বাংলা জানতে চাইলেন ছাত্রাবাস মেরামত করতে কত টাকা লাগবে। ভবিষ্যতের বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন, বারো শ টাকা। টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, ছাত্রাবাসটিরও মেরামত হয়েছিল। সেদিন এই কিশোরের সাহস আর দৃঢ়তার জন্যেই তা সম্ভব হয়েছিল, স্কুল প্রশাসনের কারও কোনো ভূমিকার জন্য নয়।

- সেবার ফসল ভালো হয়নি। দরিদ্র কৃষকদের ঘরে হাহাকার। বঙ্গবন্ধু এমনি কিছু কৃষককে বাড়িতে ডেকে এনে গোলা উজাড় করে ধান-চাল বিলিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি তা করেছিলেন বাবাকে না জানিয়েই। পরে বাবা যখন এ কাজের জন্যে তাঁকে বকলেন, তখন তাঁর দৃঢ় উত্তর ছিল, গরিবেরও পেট আছে। তাদেরও খাবার প্রয়োজন। আমাদের বেশি ছিল, কিছু দিয়ে দিয়েছি মাত্র। সেদিন বাবা ছেলের মহানুভবতায় ক্রুদ্ধ হওয়ার চেয়ে মুগ্ধই হয়েছিলেন। প্রথম ঘটনায় বঙ্গবন্ধুর সাহস প্রতিফলিত হয় এবং দ্বিতীয়টিতে মহানুভবতা।

- তাঁর স্কুলের শিক্ষক রসরঞ্জন সেনগুপ্তের বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়ে সে। তখন শীতকাল। ভীষণ শীত পড়েছে। মুজিবের পরনে লুঙ্গি, গায়ে শার্ট, তার ওপরে চাদর। পথে সে দেখতে পেল, একটা বালক, তার চেয়েও কম বয়সি হবে। তার পরনে শুধু শতছিন্ন একটা নেংটি, গায়ে কিছুই নাই। মুজিব চটপট কোমরে জড়িয়ে নিল চাদরটা। পরনের লুঙ্গি খুলে দিল ছেলেটার হাতে। লুঙ্গি দেওয়ার পরও ছেলেটার গা খালি। কী যে ভীষণ ঠান্ডা হাওয়া বইছে! মুজিব দেখল, তাঁর চাদর দিয়ে নিজের শরীরের ঊর্ধ্বাংশও বেশ ঢাকা চলে। সে গায়ের শার্টটাও খুলে ফেলল। ছেলেটাকে নিজ হাতে লুঙ্গি আর শার্ট পরিয়ে দিল সে। তারপর কায়দা করে গায়ের চাদর দিয়ে পুরোটা শরীর ঢেকে সে ফিরে এল বাড়িতে।

- গোপালগঞ্জে মেলা বসেছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মিলেমিশেই

শুরু করেছিল মেলা। কিন্তু মেলার আধিপত্য নিয়ে গণ্ডগোল লেগে গেল উদ্যোক্তাদের মধ্যে। অচিরেই সেটা আকার পেল সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের। এই বুঝি দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি বেঁধে যায়। সদা প্রস্তুত শেখ মুজিব ছুটলেন তাঁর অনুগত ছাত্র-যুবাদের নিয়ে। হাতে লাঠি। কেউ মারামারি করতে পারবে না। হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই। দাঙ্গা থেমে গেল। কিন্তু দাঙ্গায় যারা উসকানি দিচ্ছিল, দু-চারটা লাঠির বাড়ি খেয়ে তারা রেগে গেল। তারা শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মামলা ঠুকে দিল থানায়। সাত দিনের জেল হলো মুজিবের। মুক্তি পেয়ে এলেন বাড়িতে। রেণু (বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী চুরি করেছে যে তোমারে জেলে নিল?" শেখ মুজিব বললেন, "চুরি করি নাই, রেণু। মানুষের উপকার করতে গিয়েছিলাম। হিন্দু-মুসলমানে মারামারি-কাটাকাটি করতে নিয়েছিল, আমি সেইটা থামাতে গিয়েছিলাম।"

• এন্ট্রান্স পাস করে কলকাতা চললেন মুজিব। ১৯৪২ সাল। গেলেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়বেন বলে। মুজিব উঠলেন বেকার হোস্টেলে। রোল নম্বর ১৪। আইএ ক্লাস। ২৪ নম্বর রুমে থাকেন। একই রুমে থাকতেন শাহাদৎ হোসেন, গোপালগঞ্জের স্কুলজীবনের সহপাঠি। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের ছেলে ছিলেন শাহাদৎ। বাড়ি থেকে তাঁর টাকা পয়সা আসত না। শেখ মুজিবের নামে বাবা শেখ লুৎফর রহমান পাঠাতেন মাসে ৭৫ টাকা। সেটা দিয়ে দুই সহপাঠীর বেশ চলে যেত।

• মুজিব রোজ দেরি করে ছাত্রাবাসে ফেরেন। কিন্তু ছাত্রাবাসের নিয়ম, রাত আটটার মধ্যে সবাইকে হোস্টেলে ঢুকে পড়তে হবে। হোস্টেলের গেটে একটা রেজিস্টার খাতা আছে। ওখানে নাম লিখে স্বাক্ষর দিয়ে ফেরার সময় উল্লেখ করে ঢুকতে হয়। সেই খাতা যাচাই করে দেখা যাচ্ছে, মুজিবের ফেরার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। সে মেলা রাত করে হোস্টেলে ফেরে। হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠালেন মুজিবকে। "শেখ মুজিবুর রহমান, তুমি রোজ ন'টার পর হোস্টেলে ফেরো। এটা ঠিক নয়। আর করবে না। এবারের মতো মাফ করে দিলাম। আটটায় না পারো, ন'টার মধ্যে তোমাকে ফিরতেই হবে। কিন্তু আরেক দিন যদি তুমি দেরি করে আসো, তোমাকে জরিমানা দিতে হবে।" শেখ মুজিব বললেন, "স্যার, আমি নটার মধ্যে ফিরতে পারব না। জরিমানা দিতে হলে সেটাই বরং দেব। আপনি জানেন, বাইরে আমাকে অনেক রকমের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। দেশে দুর্ভিক্ষ। মানুষ খেতে পায় না। আমরা নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন জোগানোর চেষ্টা করছি। একটা মানুষও যদি একমুঠো খেতে পায়, সেটা ভালো। বরং আমি ফাইনই দেব।"

• স্বনামধন্য ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত তাঁর 'আট দশক' নামক স্মৃতিকথায় ১৯৪৬ সালের রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উল্লেখ করে বলেন, "এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ইসলামিয়া কলেজের সেই সব মুসলমান ছাত্রদের যাঁরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে বিপজ্জনক এলাকাটা পার করে দিতেন। এইসব ছাত্রের একজনের নাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান।"

• ১৯৪৯ সালে দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগ ভুখা মিছিল বের করে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ১৪ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

• সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর মন সব সময় কেমন অস্থির থাকত এটা সেই গল্প। ১৯৬৫ সালের কথা। নভেম্বরের ৪ তারিখ। বঙ্গবন্ধু তখনও বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেননি। ইত্তেফাক অফিসে মানিক মিয়া 'রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের' ডিকটেশন দেওয়া শেষে তাঁর ইজিচেয়ারে শুয়ে গল্প করছিলেন। এমন সময় শেখ মুজিব ঝড়ের বেগে প্রবেশ করেন অফিসে। এসেই বলতে থাকেন, "মানিক ভাই, আল্লার দোহাই, আমাকে বিদেশে যাওয়ার একটা ভিসা জোগাড় করে দেন। বাংলার মানুষের ওপর এই অত্যাচার ও বঞ্চনা আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি জাতিসংঘে অভিযোগ জানাবো।"

• শিশুদের সাথে বঙ্গবন্ধু একেবারেই শিশু হয়ে যেতেন। সরদার ফজলুল করিমের ভাষায়, "সেবার শেখ সাহেব তাঁর এক সহকর্মীর বাড়িতে গেলেন বেড়াতে। বাড়ির উঠানে পা দিতে না দিতেই ৫-১০ বছর বয়সি শিশুদের একটা দল তুমুল মিছিল আর শ্লোগান শুরু করে দিলো! কাঠির মাথায় কাগজ লাগিয়ে, মাথায় নিশান লাগিয়ে হুলস্থুল অবস্থা! ছোট্ট উঠানে চক্রাকারে ঘুরছে আর বলছে–'তোমার নেতা, আমার নেতা–শেখ মুজিব, শেখ মুজিব', 'ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'ইয়াহিয়া খানের মুসলমানি, এক পোয়া দুধে তিন পোয়া পানি'–ঘুরে ফিরে বার বার। শিশুদের এই কাহিনি দেখে শেখ সাহেবের মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে চিৎকার করেছেন, "আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, আর মানুষ মাত্রই একবার মরে দুইবার মরে না।" তিনি শিশু মোর্চার সামনে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে তাদেরকে বললেন, "আরে বাবা! তোদের নেতা শেখ মুজিব! এমন বিচ্ছুদের নেতা হওয়ার সাহস আমার নাই।"

• বঙ্গবন্ধুর ছাত্রজীবনের এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন মেজর জেনারেল খলিল তাঁর 'কাছ থেকে দেখা ১৯৭৩-৭৫' বইয়ে। নাজীর আহমদ নামের এক ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে বেকার হোস্টেলে থাকতে এসেছে। নাজীর বেলা ১১টার দিকে একাই কুলির মাথায় বাক্স ও বিছানা নিয়ে হোস্টেলে উপস্থিত। নাজীরকে কুলি এত ভারী ধরনের বাক্স ও বিছানা

(হোল্ড অল) নিয়ে এসে নিচের তলার সিঁড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে গেছে। নাজীরের বরাদ্দ পাওয়া কামরা দোতলায় ৩২ কিংবা ৩৩ নম্বর। নাজীর কী করবে, কাকে জিজ্ঞেস করবে, কার সাহায্য চাইবে ভাবছে। বলতে গেলে ভীতই হয়ে পড়েছে সে। ১১টার দিকে বেশিরভাগ ছাত্র কলেজে গেছে আর ব্লক পরিচালকেরা খেতে গেছে। দু-চারজন ছাত্র সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল আর কেউ কেউ ওপরে উঠে গেল। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নাজীরকে কেউ দেখেও দেখল না। এমন সময় দীর্ঘদেহী এক ছাত্র, অর্থাৎ শেখ মুজিব, তড়িঘড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছেন। কোথাও যেতে হবে, একেবারেই সময় নেই। নাজীরকে পাশ কাটিয়ে দুই পা এগিয়েও গেলেন। তারপর ফিরে এলেন। "আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি হোস্টেলে নতুন এসেছেন?" নাজীর বলল, "জী হ্যাঁ।" "কত নম্বর কামরা পেয়েছেন?" "৩২ নম্বর।" "সে তো দোতলায় আমার রুমের পাশেই। তা আপনার জিনিসগুলো নেওয়ার জন্য লোক নেই?" নাজীর নিরুত্তর। শেখ সাহেবের চিৎকার, "কই তোমরা? রিয়াসাত, জহুর?" কোথাও থেকে কোনো সাড়া নেই। অবশেষে শেখ মুজিব বললেন, "আপনি আপনার বিছানাটা উঠান, আমি ওঠাই আপনার বাক্সটা।" নাজীরও ছিল লম্বা ও শক্তিশালী। বললেন, "না, তা হয় না। যদি ধরতেই চান, তবে আপনি বিছানাটা নিন, আমি ওঠাই বাক্স। ওটা তো ওঠানোই কঠিন। তারপর বয়ে নিয়ে অতটা ওপরে যাওয়া..." ততক্ষণে মুজিব লোহার বাক্সটা কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি বাইতে শুরু করেছেন। মুজিব নাজীরকে নিয়ে গেলেন তাঁর কামরায়। দরজা খুলে নিজের ঘর থেকে পরিত্যক্ত নেকড়ার ঝাড়ন এনে মোটামুটি খাট, টেবিল ও চেয়ার ঝেড়ে বললেন, "এবার বিশ্রাম করুন।"

বঙ্গবন্ধু যে কী বিশাল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নের ঘটনাটি থেকে–

- পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলায় ফিরে আসার পর নিজের পরম রাজনৈতিক শত্রুদেরও ক্ষমা করে তিনি তাদের ব্যক্তিগতভাবেও গোপন সাহায্য দিয়েছেন। সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী ঘটনা বাংলাদেশ ও বাঙালির সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য কুখ্যাত মর্নিং নিউজ (অধুনালুপ্ত) পত্রিকার অবাঙালি সম্পাদক বদরুদ্দিনের প্রাণরক্ষা এবং তাকে ঢাকার আসাদগেটের বাড়ি বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রায় তার পুরো দামসহ পাকিস্তানে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া। অথচ এই বদরুদ্দিন দিনের পর দিন শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে লিখতেন, তার চরিত্র হনন করতেন। বঙ্গবন্ধুর এই মহানুভবতায় চিরকৃতজ্ঞ বদরুদ্দিন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ শুনে বলেছিলেন, "ইয়ে ফেরেশতা কো তোমলোক খুন কিয়া?"

- যুদ্ধের পরে অনেক ধর্ষিত নারী অপমান ও ভর্ৎসনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তখন পিতার ভূমিকায় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বললেন, "কেউ যদি বীরাঙ্গনাদের পিতার নাম জিজ্ঞেস করে তবে বলে দিও তাঁদের পিতার নাম শেখ মুজিবুর রহমান আর তাঁদের ঠিকানার পাশে লিখে দিও ধানমন্ডি ৩২ নম্বর।".... অদ্ভুত দায়িত্ব আর মমতামেশানো একটা কথা। যা শুধু একজন পিতার পক্ষেই বলা সম্ভব। সেই চরম সংকটকালে লাখো বীরাঙ্গনা পরম নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছিলেন এই একটি মাত্র কথায়।

- একসাথে খাবেন বলে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিরাপত্তারক্ষীকে আদর করে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার অসাধারণ একটি দুর্লভ ছবি। সবাই এভাবে জীবন দেখতে পারে না। আর এ কারণেই সবাই বঙ্গবন্ধু হতে পারে না।

- একজন কৃষক তার নিজের ক্ষেতের সবজি নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। বাড়ির কেয়ারটেকার তাকে বসিয়ে সবজিগুলো নিয়ে গেলেন দোতলায়। বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে কথা বলছিলেন। কথা বলা অবস্থায় কেয়ারটেকার তাঁকে সবজির কথা বললেন। বঙ্গবন্ধু পাঞ্জাবির পকেট থেকে ২০ টাকা বের করে দিলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কেয়ারটেকার ভাবল সামান্য কিছু সবজির জন্য ২০ টাকা দেওয়ার কি দরকার? সে ১০ টাকা রেখে দিয়ে বাকি ১০ টাকা দিল কৃষকের হাতে। টাকা পেয়ে কৃষক অবাক হলো এবং দৌড়ে দোতলায় উঠে গেল। ততক্ষণে টেলিফোন রাখলেন বঙ্গবন্ধু। কৃষক বঙ্গবন্ধুর কাছে ১০ টাকা ফেরত দিয়ে বললেন, "এগুলো আমার ক্ষেতের সবজি, আমি আপনার জন্য এমনি এনেছি, টাকা লাগবে না।" জবাবে বঙ্গবন্ধু বললেন, "কিন্তু আমি তো ২০ টাকা দিয়েছিলাম।" কৃষক জবাব দিল, "উনি তো আমাকে ১০ টাকা দিলেন।" এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "যে দেশে দোতলা থেকে নিচতলায় নামতেই ২০ টাকা ১০ টাকা হয়ে যায়, সে দেশে কত টাকার বাজেট প্রণয়ন করলে তা জনগণের নিকট পৌছাবে?"

- ১৯৭৫ সালের ৭ মে। ৮ দিন আগে পিতা শেখ লুৎফর রহমানকে হারিয়েছেন। শোকে মুহ্যমান সে সময়, তবুও নেতা-কর্মী সকলকে নিয়ে জাহাজে করে রওনা দিলেন টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে, পিতার চেহলাম এর জন্য। রাত সাড়ে ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু দেখতে এসেছিলেন, সবার ঠিকমতো শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা। একজনের কাছে এসে দেখলেন, মাথার নিচে হাত দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এরপর তিনি নিজের কেবিনে গিয়ে নিজেরই একটা বালিশ এনে ঐ ব্যক্তির মাথার নিচে দিয়ে দেন।

ফ্রান্সের গীতিকবি লামারতিন এমনি গণমুখী রাজনীতির বৃত্তে যুগলবন্দি নেতা ও জনতার উদ্দেশ্যেই হয়তো বলেছিলেন, "Affection always affection for the people and the people in return will lend their

heasts." আদর্শ, কর্ম ও প্রণোদনায় জনগণের নৈকট্য প্রত্যাশী বঙ্গবন্ধুর প্রতি একজন বিদেশির প্রশ্ন ছিল, "আপনার দোষ কোথায়?" বঙ্গবন্ধু উত্তর ছিল, "আমার সবচেয়ে বড় ও একমাত্র দোষ হলো, আমি আমার জনগণকে বেশি ভালোবাসি।" '৭২-এর ৭ জুন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আসি নাই, আমি সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ভালোবাসি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আমাকে ভালোবাসে। বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের দুটি প্রবলতম প্রকাশ ছিল ভালোবাসা এবং সাহস। ভালোবাসার মঙ্গলময় সিঁড়ি বেয়ে তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল জনগণের মঙ্গলচিন্তা। আর অসীম সাহস তাঁকে বসিয়েছিল নেতৃত্বের শীর্ষবিন্দুতে। মানবিক দোষ-গুণের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই মানুষটির সকল বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে যায় তাঁর দুরন্ত সাহস আর উদ্বেলিত ভালোবাসার আড়ালে। রাজনীতির অঙ্গনে তাঁকে সাহস আর ভালোবাসার প্রতীক বললে অত্যুক্তি হবে না। ভালোবাসার আবেগ বঙ্গবন্ধুকে উদ্বিগ্ন করেছিল সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট দর্শনে, তাড়িত করেছিল তাঁকে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, প্রেরণা জুগিয়েছিল জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে এবং প্রত্যয়দীপ্ত করেছিল তাঁকে গণমানুষের ভালোবাসার বিনিময়ে নিজের জীবনকে বিসর্জন দিতে। একেবারে সাধারণ মানুষ, যাদের সাথে বঙ্গবন্ধুর রক্তের সম্পর্ক ছিল না, রাজনীতির সম্পর্কও ছিল না–ছিল প্রাণের সম্পর্ক। এই অতি সাধারণ মানুষগুলোও বঙ্গবন্ধুকে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতেন। এই যে নির্ভেজাল ভালোবাসা, এটা শুধু কথা দিয়ে অর্জন করা যায় না, এর পেছনে প্রয়োজন একটি ভালোবাসার মন। এ ধরনের দুইটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

- এক অতিদরিদ্র দিন মজুরকে বঙ্গবন্ধু একদিন ১০ টাকার একটি নোট দিয়েছিলেন কিছু কিনে খাবার জন্য, কারণ ঐ দিন কাজ না পেয়ে সে অভুক্ত ছিল। দরিদ্র ব্যক্তিটি অভুক্তই রয়ে গেল, কারণ নোটটি সে হাতছাড়া করবে না। লোকটি নাকি আমৃত্যু নোটটি আগলে রেখেছিল। কোনো অবস্থাতেই টাকাটি খরচ করতে রাজি হয়নি।

- ঘটনাটি ১৯৫৪ সালের, নির্বাচনের সময়। সেই নির্বাচনে ভোট-প্রার্থনারত বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হয় অচেনা এক বৃদ্ধ মহিলার। বঙ্গবন্ধুর প্রতি সেই বৃদ্ধ মহিলার অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শন বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে দারুণভাবে রেখাপাত করে। অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। "আমার মনে আছে খুবই গরিব এক বৃদ্ধ মহিলা কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, শুনেছে এই পথে আমি যাব, আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বলল, "বাবা আমার এই কুড়েঘরে তোমায় একটু বসতে হবে।" আমি তার হাত ধরেই তার বাড়িতে যাই। অনেক লোক আমার সাথে, আমাকে মাটিতে একটা পাটি বিছিয়ে বসতে দিয়ে এক বাটি দুধ, একটা পান ও চার আনা পয়সা এনে আমার সামনে ধরে বলল, "খাও বাবা, আর পয়সা কয়টা তুমি নেও, আমার তো কিছুই নাই।" আমার চোখে পানি এলো। আমি দুধ একটু মুখে নিয়ে, সেই পয়সার সাথে আরও কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে বললাম, "তোমার দোয়া আমার জন্য যথেষ্ট, তোমার দোয়ার মূল্য টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যায় না।" টাকা সে নিল না, আমার মাথায়-মুখে হাত দিয়ে বলল, "গরিবের দোয়া তোমার জন্য আছে বাবা।" নীরবে আমার চক্ষু দিয়ে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছিল। সেইদিনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, 'মানুষেরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না।' "

বঙ্গবন্ধু ছিলেন জনস্বার্থে ও পরার্থে নিবেদিত একজন অসম্ভব রকমের মানবিক মানুষ। নেতা বঙ্গবন্ধুর মাঝে পিতা সত্ত্বাটি সবসময়ই মিলেমিশে ছিল। সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে বাবা-মায়েরা যেমন 'আমার ছেলে, আমার মেয়ে' বলে গর্ববোধ করতে পছন্দ করেন, তেমনি বঙ্গবন্ধু সব সময় বলতেন 'আমার মানুষ, আমার দেশের মানুষ, আমার শ্রমিক, আমার কৃষক'। ১৯৭১ সালে সারা দেশ যখন উত্তপ্ত, আনাচে কানাচে পুড়ছে টায়ার, মিছিলের আওয়াজ আর বারুদের গন্ধে বাতাস যখন ভারী, সেই সময় তেসরা মার্চে, সাত মার্চেও বারবার তিনি বলেছেন, রিকশাওয়ালাদের কে যাতে ভাড়া একটু বাড়িয়ে দেয় সবাই, শ্রমিকদের বেতন যেন আটকে না থাকে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালের ১ মে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। একইসাথে সাধারণ জনগণের প্রতি সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ দিবস উদ্‌যাপনে শহীদ মিনারে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "সরকারি কর্মচারীদের বলি, আপনাদের খাছিলৎ পরিবর্তন করুন। মনে রাখবেন, আপনারা যাদের উপর ডাণ্ডা ঘোরান, সেই সব দরিদ্র মানুষের টাকায়ই আপনাদের সংসার চলে। আপনারা দুর্নীতি পরিহার করুন। ইয়াহিয়া ৩০৩ জনকে ছাঁটাই করেছেন, আমরা তা করব না। জনসাধারণকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেব-ওই যে দুর্নীতিবাজ কর্মচারী। তাদেরকেই বলব, সাফ করো এই জঞ্জাল। বড় কে আর বড় হতে দেবো না; ছোটকে আর ছোট হতে দেবো না। সমাজে ছোট-বড় ভেদাভেদ তুলে দিব।"

জনগণের কাছে তিনি বন্ধু। জাতির কাছে তিনি পিতা। বিদেশিদের চোখে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা (Founding Father)। তাঁর সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিক সিরিল ডান বলেছেন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষিতে এবং জন্মসূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি। তাঁর দীর্ঘ শালপ্রাংশু দেহ, বজ্রকণ্ঠ, মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার বাগ্মিতা এবং জনগণকে নেতৃত্বদানের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সাহস তাঁকে এ যুগের এক বিরল মহানায়কে পরিণত করেছে।

বিলেতের মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রয়াত নেতা মনীষী লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে বলেছেন, জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী, ডি ভ্যালেরার চেয়েও শেখ মুজিব এক অর্থে বড় নেতা। নতুন মিসরের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হাসনাইন হাইকেল (আল আহরাম, কাগজের সাবেক সম্পাদক ও প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু) বলেছেন, নাসের কেবল মিসরের নন, সারা আরব জাতির মুক্তিদূত। তাঁর জাতীয়তাবাদ আরব জনগণের শ্রেষ্ঠ মুক্তিপ্রেরণা। তেমনি শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন, সারা বাঙালি জাতির মুক্তিদূত। তাঁর বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব অভ্যুদয়মন্ত্র। মুজিব বাঙালির অতীত ও বর্তমানের শ্রেষ্ঠ মহানায়ক। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, "আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি। শেখ মুজিবকে দেখলাম। ব্যক্তিত্বে ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়। আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।" বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন লন্ডনের এক বাঙালি সাংবাদিকের কাছে লেখা শোকবাণীতে বলেন, "এটা আপনাদের কাছে অবশ্যই এক বিরাট ন্যাশনাল ট্র্যাজেডি। আমার কাছে এক পরম শোকাবহ পার্সোনাল ট্র্যাজেডি।" বঙ্গবন্ধু আজ সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মের স্মৃতি আছে আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বহু চেষ্টা করেছে বঙ্গবন্ধুকে বাঙালির হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ভারতের মনীষী-সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্করের ভাষায়–

"যত দিন রবে পদ্মা-মেঘনা
গৌরী-যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।"

বঙ্গবন্ধুকে, তাঁর আদর্শকে, আমাদের মধ্যে ধরে রাখতেই হবে চিরসজীব করে। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কথা ভাবা যায় না। তিনি শুধু বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না, তাঁর দেখা স্বপ্নের একটা অংশের রূপকারও ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা, তিনি নিজেকে উত্তীর্ণ করেছিলেন জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়কে। তাঁর মহৎ গুণাবলি, তাঁর প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অসাধারণ সাহসিকতা, উদার মানবিকতাবোধ এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক হিসেবে তাঁর অবদান গগনচুম্বী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ আমাদের মাঝে নেই; কিন্তু স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাঁর প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ আজও আমাদের মাঝে আলোকবর্তিকার মতো। সেই আলোকবর্তিকা অনির্বাণ। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসের কিংবদন্তির মহানায়ক। এ মহানায়কের মহামন্ত্রেই একদিন গড়ে উঠবে স্বপ্নের বাংলাদেশ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেদিন সেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিনই বাঙালির হৃদয়ে উদ্ভাসিত হবে আরও একটি গর্বিত শ্লোগান–'এই মোদের সোনার দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।' বিশ্বের বুকে যতদিন বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধুও থাকবেন স্বমহিমায় চিরভাস্বর ও দেদীপ্যমান। কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অসীমের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ। এই হোক 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী' পালনের মূল লক্ষ্য।

কমডোর এ জেড এম জালাল উদ্দিন, (সি), পিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি, বিএন
রেজিস্ট্রার
বিএসএমআরএমইউ

২১০০ সালের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা

মো. আবুল হোসেন

ভূমিকা

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর আয়োজিত এক জনসভায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, "একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি–আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ।"

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয়লাভের পরেও তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে দেয়নি, উপরন্তু ২৫মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান মিলিটারিরা শুরু করে অপারেশন 'সার্চ লাইট'। নির্বিচারে হত্যা করা হয় নিরস্ত্র বাঙালি, গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধুকে, শুরু হয় বাঙালি জাতির মুক্তির যুদ্ধ।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। এ সরকারের অধীনেই গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর, ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে আসে বিজয়। ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দান, যেখান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, সেখানেই বাংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় নতুন একটি দেশ, বাংলাদেশ।

যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে, তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশে। স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা দেশে ফিরেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে উদ্যোগী হন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়ন, সামাজিক সংরক্ষণ, দারিদ্র্য নিরসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জ্বালানি খাতে অভূতপূর্ব অবদানের মাধ্যমে দেশকে নিয়ে যান এক অন্য উচ্চতায়। সেই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনের প্রত্যয় নিয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রহণ করেন ২১০০ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, যার অধীনে সমন্বিতভাবে প্রণয়ন করা হয় রূপকল্প ২০২১, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি এসডিজি (২০৩০) এবং উন্নত বাংলাদেশ (২০৪১) এর পরিকল্পনা।

অগ্রগতির সোপানে বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও গর্বের প্রতীক, উজ্জীবিত বক্তা এবং স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর মৃত্যুর চার দশক পর বাংলাদেশ আজ অদম্য। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে। এই দেশটার সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশ্বকেই চমকে দিয়েছে। আর্থসামাজিক সূচকগুলোয় প্রমাণ দেয় বাংলাদেশ আজ এই উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লাখো শহীদের স্বপ্নের প্রতিও দেশ আজ সুবিচার করে চলেছে। বাংলাদেশ এখন টেকসই প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আদর্শ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠেছে। বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের উন্নয়নমুখী নীতিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে ২২টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

- প্রতি গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে তুলে সমিতির সদস্যদের সন্তান কিংবা পোষ্যদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তির হার ১০০ ভাগ নিশ্চিত করা
- বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা
- প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা
- বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীত করা
- ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট ধরে নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া
- নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা
- তথ্য প্রযুক্তিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করা

এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোর প্রতিটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার দিকে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে।

এমডিজি'র ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ১৯৩টি সদস্য দেশ ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ অনুমোদন করেছে, যাতে ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্য এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা সন্নিবেশ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব অভিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলই প্রথম ১১টি অভিষ্ট লক্ষ্যের ধারণা দেয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেখান থেকেই ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্যের উদ্ভব হয়।

রূপকল্প ২০৪১ এর শ্লোগান–'শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ'। রূপকল্প ২০৪১ এর মুখবন্ধে বলা আছে–'আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। শুরু হয়েছে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ঐতিহাসিক কালপর্ব'। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী এবং উন্নত জনপদ। সুশাসন, জনগণের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন হবে এই অগ্রযাত্রার মূলমন্ত্র। রূপকল্প ২০৪১ এ ২৬টি লক্ষ্যের কথা বলা আছে। যার উল্লেখযোগ্য অংশ হলো–

- আগামী ২০ বছরের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এমন সব সংস্কার কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে যার ফলে বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৯.৯ শতাংশ। মানুষের গড় মাথাপিছু আয় হবে সাড়ে ১২ হাজার ডলার। চরম দারিদ্রতা শূন্যে নেমে আসবে। মাঝারি দারিদ্র্যও কমে আসবে ৫ শতাংশের নিচে।

- বাণিজ্য কাঠামোয় ব্যাপকভাবে পরিবর্তন আনা হবে। উৎপাদন, বণ্টন থেকে শুরু করে জাহাজীকরণ পর্যন্ত সর্বস্তরে একটি সহজ, সুন্দর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে যেভাবে একটি শক্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলা হয়েছে। এ ধারা আরও শক্তিশালী করা হবে।

- কৃষিখাতে যে প্রবৃদ্ধির ধারা বিশেষ করে চালের যে উচ্চ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি তা আরও বেগবান করা, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদের উন্নয়ন সাধন করা হবে। উচ্চ জিডিপি অর্জনে নারীদের আরও কাজের সুযোগ করে দেওয়া হবে। পোশাক, পাদুকা, ইলেকট্রনিক্স শিল্পে তাদের আরও বেশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে ২০৪১ সাল নাগাদ ৯২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে এবং বছরে গড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হবে ৪৬০০ মেগাওয়াট।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্তৃত দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত, কারিগরি ও আর্থসামাজিক দলিল ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। ব-দ্বীপ পরিকল্পনার রূপকল্প, অভীষ্ট এবং কৌশলগুলো বাস্তবে রূপায়নের জন্য এ মহাপরিকল্পনার একটি সমন্বিত ও সুসংহত ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশের পানি বিষয়ক নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিঘাত মোকাবিলা, টেকসই পরিবেশ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করবে।

নদীবিধৌত বাংলাদেশ মূলত একটি পলি ভরা ব-দ্বীপ। পদ্মা, মেঘনা আর যমুনা নদীর মিলনস্থলে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বৃহত্তম গতিশীল এ ব-দ্বীপ। এদেশে রয়েছে ছোট-বড় প্রায় ৭০০ নদ-নদী। যার মধ্যে ৫৭টি আন্তঃদেশীয় নদী (৫৪টি ভারতের সাথে, ৩টি মিয়ানমারের সাথে)। প্রতিবছর প্রবাহিত এসব নদীতে পলির পরিমাণ হয় প্রায় এক থেকে এক দশমিক চার বিলিয়ন টন। ফলে, বর্ষা মৌসুমে দেখা দেয় পানির আধিক্য আর শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা। এ ছাড়াও বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ সালের সিডর, ২০০৯ সালের আইলা এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা, এ দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। ছয়টি জেলায় ২০১৭ সালে আগাম বন্যায় হাওরের ফসল নষ্ট হলে চরম দুর্দশায় পড়ে হাওরের মানুষ।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে দেশের আটটি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির মাত্রার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে একই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন জেলাগুলোকে একেকটি গ্রুপের আওতায় আনা হয়েছে যাকে 'হটস্পট' (পানি ও জলবায়ু উদ্ভূত প্রায় অভিন্ন সমস্যাবহুল অঞ্চল) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এসব স্পটগুলো হলো উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী অঞ্চল ও মোহনা এবং নগরাঞ্চল।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা মূলত তিনধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম ধাপে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ। প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প। দ্বিতীয় ধাপে ২০৫০ এবং তৃতীয় ধাপে ২১০০ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা হবে।

উপসংহার

স্বাধীনতার খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব। সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের জন্য তাঁরই সুযোগ্য কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশ রয়েছে উন্নয়নের সিঁড়িতে। এই উন্নয়নে প্রয়োজন বাংলার জনগণের সহযোগিতা ও আস্থা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভের পর বাংলাদেশ এখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু করেছে। সীমিত সম্পদ এবং সীমাবদ্ধ সরকারি খাতের সাথে অন্যান্য প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে দৃঢ় সংকল্প ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের বাংলাদেশ হবে সুখী সমৃদ্ধিশালী উন্নত বাংলাদেশ।

ড. মোঃ আবুল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

সমৃদ্ধ অর্থনীতির বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু

খন্দকার আতিকুর রহমান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি, সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে অবদান রেখেছেন দেশের অর্থনীতিতে। সংবিধানেই স্থান দিয়েছেন দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথ নির্দেশনা। বৈষম্য তাড়াতে ব্যক্ত করেছেন প্রতিশ্রুতি। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ছিলেন নির্ভীক। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দারিদ্র্য দূরীকরণের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যান বঙ্গবন্ধু। ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল সংস্কার, শিল্প বিকাশে নয়া উদ্যোগ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান, কৃষির আধুনিকায়নে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ, সমবায় চেতনা বিকাশে শুরু করেছিলেন নানা কর্মযজ্ঞ। রুগ্‌ণ অর্থনীতিকে মজবুত করতে পারে সুচিন্তিত পরিকল্পনা। বঙ্গবন্ধু সেই সত্য বুঝতে পেরেছিলেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের নিয়ে তিনি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করলেন। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো, সদ্যস্বাধীন দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণের। তাঁরা প্রণয়ন করেন দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭২-৭৬)। এটি নিছক একটি পরিকল্পনা দলিল ছিল না, ছিল স্বপ্নপূরণের এক নতুন পদক্ষেপ। জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা, নারী জাগরণ কর্মসূচি ছড়িয়ে দিতে সব সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন নির্ভীক। সাধারণ জনগণ, পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় আনতে গ্রহণ করেন নানা পদক্ষেপ। তাঁর উন্নয়ন ভাবনায় পরিস্ফুটিত হয় ভবিষ্যৎ বিকাশের রেখা।

প্রণোদনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু গড়ে তুলতে চেয়েছেন এক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি। দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, মাত্রা ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেন। যার মূলভিত্তি ছিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের মাধ্যমে মাটি ও মানুষের সমন্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। পাকিস্তানের একচোখা অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সদা সচেতন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, এই বৈষম্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মাত্রার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মাত্রাও ছিল। আর তাই সে সময় পাকিস্তান সরকারের ফেডারেল কন্ট্রোল অব ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাক্টের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। এই আইনের মাধ্যমে শিল্প খাতের নিয়ন্ত্রণ প্রাদেশিক সরকারকে পাশ কাটিয়ে পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন।

পাকিস্তান আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল ২২টি পরিবারের হাতে। বঙ্গবন্ধু এই ভয়াবহ বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ যে একটা বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে রয়েছে তা বঙ্গবন্ধু নিশ্চিতভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু পাশাপাশি অসংখ্য বাধা মোকাবিলা করে সাফল্য পাওয়ার যে সক্ষমতা এ দেশের জনগণের রয়েছে সে সত্যটিও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৭২ সালে প্রজাতন্ত্রের যে সংবিধান প্রস্তুত করা হয় সেখানেও তাঁর অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধির দর্শন প্রতিফলিত হয়। এ পথে দেশকে এগিয়ে নিতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। নিঃসন্দেহে তিনি সঠিক পথেই এগুচ্ছিলেন। স্বাধীনতার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার অনেকটাই বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছিলেন। ১৯৭২ সালে আমাদের অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকার। আর আমাদের রিজার্ভে তখন তেমন কোনো বৈদেশিক মুদ্রাও ছিল না। শতকরা আশি ভাগের মতো মানুষ ছিল দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের কল্যাণে যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো এবং সত্যিকার অর্থে কোনো নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান না থাকা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে।

দেশের ভেতরে ও বাইরে বেশ কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে তখন খাদ্যশস্যের ভয়াবহ সংকট চলছিল। ওই সময়টায় আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যের সংকটের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির মতো চ্যালেঞ্জও বঙ্গবন্ধুর সরকারকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। আর এগুলো মোকাবিলার জন্য তাঁর হাতে সম্পদও ছিল খুব সীমিত। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশ আমাদের বিরুদ্ধে বৈরী অবস্থানে। তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু এই অল্প দেশজ সম্পদ এবং কিছু আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়েই ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশের অর্থনীতিকে তুলে আনতে পেরেছিলেন।

বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণকে প্রজাতন্ত্রের মালিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোতে যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হলো জনগণের উন্নয়নের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। যা আজকের দিনে অমর্ত্য সেন ও মার্কিন অর্থনীতিবিদ রিচার্ড এইচ থ্যালারের মানবিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক

উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু যে ধারণাটি পোষণ করতেন তা হলো, মানুষ যদি হতদরিদ্র থাকে তবে দেশও হতদরিদ্র থাকবে। কাজেই মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে যখন মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা যাবে, তখন দেশও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর অর্থনীতির ধারণায় সম্পদের সুষম বণ্টন ও সম্পদ সৃষ্টির বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ দুটি উপাদানই মানবিক উন্নয়নের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতির মধ্যে অন্যতম একটি ছিল সমাজতন্ত্র। তবে বঙ্গবন্ধু এই সমাজতন্ত্রকে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেলিনের সমাজতন্ত্র বা গণচীনের মাও সে-তুংয়ের সমাজতন্ত্র বলে মনে করতেন না। তিনি যেটি বলতেন, এই সমাজতন্ত্র হলো বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র। যার মূলভিত্তি ছিল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা। এখানে সম্পদের সুষম বণ্টনের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল মানুষের সম্পদ সমপরিমাণ থাকবে। বরং এটি হচ্ছে প্রতিটি মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে খেয়ে-পড়ে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করবে। এই অধিকারের প্রধান একটি বিষয় ছিল জনগণের আয় যাতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি রাখা যায়। এটি নিশ্চিত করার জন্য যারা বিত্তশালী বা অধিক সম্পদের মালিক হবেন তাদের ওপর যৌক্তিক ভিত্তিতে অধিক কর আরোপ করা। আবার এই করের টাকার মাধ্যমে কম বিত্তশালী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় খাত থেকে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সরকার।

অন্যদিকে দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কার্যকর ভূমিকা ছিল বঙ্গবন্ধুর অর্থনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর মূল লক্ষ্য ছিল যদি উদ্যোক্তা তৈরি করা যায়, তাহলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের উর্বর ভূমিকে বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপাদান হিসেবে কৃষিকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি যেমন শিক্ষাকে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করেছেন তেমনি রাষ্ট্রের উন্নয়নের কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য কৃষকের ফসল ফলানোর অধিকার নিশ্চিত করাকেও বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে অর্থকে বিনিয়োগ বলে মনে করা হলেও শিক্ষা, কৃষি, জনকল্যাণ ও শিল্পও যে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হতে পারে বাঙালির মধ্যে বঙ্গবন্ধু এই ধারণাটি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই কারণে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন—ফসলের বীজ, সেচযন্ত্র, সার ও কীটনাশক অধিক মূল্যে আমদানি করে নামমাত্র মূল্যে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। কম সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ও কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য তিনি কৃষি সংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্কার, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র উন্নয়ন, শিক্ষার সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু কৃষি গবেষণাকে অনুপ্রাণিত করেন, একই সঙ্গে কৃষি গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে নিয়েছিলেন বহুমুখী পরিকল্পনা, দিয়েছিলেন অর্থনীতির নতুন সূত্র। তাঁরই উদ্ভাবিত উন্নয়ন দর্শন বাস্তবে রূপ দিতে অন্যতম মৌল-উপাদান হিসেবে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, দেশে দারিদ্র্য বলে কোনো শব্দ থাকবে না। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন গ্রামীণ সমাজে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রতিটি গ্রামে গণমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে, যেখানে গরিব মানুষ যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হবেন, যেখানে সমবায়ের সংহত শক্তি গরিব মানুষকে জোতদার-ধনী কৃষকের শোষণ থেকে মুক্তি দেবে; যেখানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা গরিবের শ্রমের ফসল আর লুট করতে পারবে না, যেখানে শোষণ ও কোটারি স্বার্থ চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে প্রায় ৫০১ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকাই ছিল কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে, কৃষকদের স্বার্থে। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, কৃষকরা বাঁচলে স্বনির্ভর হবে দেশের অর্থনীতি। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনে বেশ কিছু মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল—প্রথমত, স্বনির্ভরতা–যতটা সম্ভব দেশের সম্পদ ব্যবহার করা; দ্বিতীয়ত, বিদেশ ও দাতাদের কাছ থেকে শর্তহীন অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে স্বাগত জানানো এবং ক্রমান্বয়ে এ ধরনের নির্ভরতা হ্রাস করা;

তৃতীয়ত, ১৯৭৪ সালের শুরতেই বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ সীমা ২৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে তিন কোটি টাকা করা হয়।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি অর্থনীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সর্বশেষ ঘোষণাটি আসে। তিনি ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি সমবায়ের ঘোষণা দেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমি ঘুরে মালিকানা দলিলে অক্ষুণ্ন রেখেই সব কৃষিভূমিকে সমবায়ের অধীনে একীভূত করে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত চাষবাসের মাধ্যমে পাঁচগুণ ফসল ফলানো সম্ভব হবে। জমিতে যারা শ্রম দেবেন, সে কৃষকরা উৎপাদনের একটি বড় অংশ পাবেন। রাষ্ট্রের কাছেও যাবে একটি অংশ। এভাবে খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য বিনির্মাণ করা হবে এ প্রক্রিয়ায়।

শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনে দিতে বঙ্গবন্ধু বিদেশি সহায়তা লাভের জন্য ছুটেছেন নানান দেশে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এই সাড়ে তিন বছর, স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি আদায় ও দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে বিদেশি সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে যেতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। আঞ্চলিক সহযোগিতার অর্থনৈতিক সুফলের প্রতি শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি ছিল। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর দেশে ফেরার চার সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি কলকাতা সফর করেন। এর প্রধান কারণ ছিল মুক্তিসংগ্রামের সময়ে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানানো। কিন্তু সেই সময়েই ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এর সন্ধ্যায় কলকাতার রাজভবনে তাঁর সম্মানে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রদত্ত ভোজসভায় তিনি একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন। তিনি তাঁর আনুষ্ঠানিক ভাষণে বলেছিলেন, "আমার একান্ত কামনা উপমহাদেশে অবশেষে শান্তি ও সুস্থিরতা আসবে। প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতার নীতির অবসান হোক। আমাদের জাতীয় সম্পদের অপচয় না করে আমরা যেন তা আমাদের দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহার করি।" ভারত সফরে দেশটির সাথে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তি সাক্ষর করেন। অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে নয়াদিল্লির সহায়তা চান জাতির জনক।

১৯৭২-এ তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সফরকালে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত চট্টগ্রাম বন্দরকে নৌচলাচল উপযোগী করতে সোভিয়েতের সহযোগিতা চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৫ সালে যথাক্রমে অটোয়া অর কিংসলি কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের মঙ্গলার্থে নিতে পেরেছিলেন বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর সেই শিল্পোন্নত সমৃদ্ধ এশীয় দেশ জাপানের সঙ্গে আমাদের অর্থবহ সম্পর্কের সূচনা করেছিল। সেই সফরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগের জন্যই আজ বঙ্গবন্ধু সেতু নিয়ে আমরা গর্ব করতেই পারি। ১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধে দিল্লি সফরকালে ভারতের সঙ্গে আমাদের চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৭৫ সালের প্রারম্ভেই শুরু হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রক্রিয়া। ভারতের সঙ্গে একটি অর্থপূর্ণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস বঙ্গবন্ধু নিয়েছিলেন।

তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। পরিশেষে আশার কথা এই যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণে তাঁরই নির্দেশিত পথে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে দেশের অর্থনীতি এগিয়ে নিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

খন্দকার আতিকুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

বঙ্গবন্ধু ও আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন

রাজু আহমেদ

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালির স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশ গঠনের কাজে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণতন্ত্রের অতন্দ্র সৈনিক। তাঁর কর্ম ও সাধনা, চিন্তা ও ধ্যানে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। কৈশোর থেকেই তিনি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে ছিলেন সোচ্চার। বাহান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা-আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের মহান গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ–প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রধান শক্তির উৎস ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে তিনি ছিলেন সর্বদা বজ্রকণ্ঠ। তাঁর অতুলনীয় গণমুখী নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে '৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ের পর ১৯৭১-এ এসে উপনীত হয়।

স্বাধিকার শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে সবচেয়ে গৌরবময় ভূমিকা ছিল বাঙালিদের। বাঙালি জাতি বারবার তার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে। আলাদা জাতিসত্তার পরিচয় দিতেও পিছপা হয়নি। মূলত বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয় ইংরেজ শাসনামলে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫-১৯০৮ পর্যন্ত স্বদেশি তথা বয়কট আন্দোলন, ১৯১৯-১৯২৪ পর্যন্ত খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল এই বাংলার মাটিতে। জাতি হিসেবে বাঙালি স্বাধীনচেতা। ভারতবর্ষে প্রথম ঔপনিবেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধের চেষ্টাও হয়েছে এ বাংলায়। পলাশীতে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় সমগ্র ভারতের প্রেক্ষিতে এক অনস্বীকার্য ও অনভিপ্রেত ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বঙ্গেই দুই শ বছরের ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সামরিক লড়াই শুরু হয়েছিল। ব্যারাকপুরে ১৮৫৭ সালে প্রথম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূতিকাগারও ছিল এই বাংলা। বাংলার মাটিতেই ব্রিটিশ ভাইসরয়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ করেছিলেন নবকুমারের মতো মানুষ। বাংলাতেই গড়ে উঠেছে প্রথম জাতীয়তাবাদী পত্রিকা, নীল চাষ নিয়ে সংঘটিত হয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লড়াই। বাঙালির স্বাধিকার চেতনাকে রুদ্ধ করতেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের গ্রহণ করতে হয়েছে ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি। বঙ্গভঙ্গ কিংবা সাম্প্রদায়িকতার যে বিস্তার ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র তার শাসন বজায় রাখতে ব্যবহার করেছে, তা বাংলার মানুষের রাজনৈতিক ঐক্যকে বিনষ্ট করার প্রায়োগিক মাধ্যমই বটে। ইংরেজবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের পর পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। যে বাঙালি স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরে নিজেদের মতো করে, সেই বাঙালিকে সংগঠিত রাখার কঠিন কাজটি বঙ্গবন্ধু করেন দক্ষ হাতে। পাকিস্তানের শাসন-শোষণ ও অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে জীবনের একটা বড় সময় শেখ মুজিবকে বার বার জেল-জুলুম ও অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করতে হয়। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বাঙালির সব আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়েই শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন জাতির অবিসংবাদিত নেতা এবং ভূষিত হন বঙ্গবন্ধু উপাধিতে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারা বাংলার মানুষ একবিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছিল, যোগ দিয়েছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মচারী, রেডিও টেলিভিশনের শিল্পী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবাই এসে মিলিত হয়েছিল অধিকার আদায়ের আন্দোলনে। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, প্রকৃত অর্থেই অভিন্ন ও একাত্ম। বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে অনিবার্যভাবে এসে যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। জনগণের স্বার্থের সঙ্গে, দেশের স্বার্থের জন্য তিনি নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। এ কারণেই বোধ করি কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলাদেশের আর এক নাম রেখেছেন 'Mujibland'। এক অর্থে বঙ্গবন্ধুই একটা পর্বে, বাংলাদেশের ইতিহাস। তাঁর জীবন ও কর্মের ক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বিশেষ সময়ের কথা আমরা জানতে পারি। শোষক ও

শোষিতের সংগ্রামে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন দেশকে স্বাধীন করতে। এ মুক্তির সংগ্রামে তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ ভেবে জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, কিশোর বয়স থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, সর্বদা কথা বলেছেন সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং হয়ে উঠেছেন স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক।

কিশোর বয়সেই তাঁর অধিকার সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৪০ সালের একটি ঘটনায়। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ স্কুল পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন শেষে বাংলোতে ফেরার পথে একদল ছাত্র তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। অকপটে বলে যায়, বর্ষাকালে ছাত্রাবাসের ছাদ চুঁইয়ে পড়া পানিতে ছাত্রদের বিছানাপত্র নষ্ট হওয়ার কথা। ছাত্রাবাসটি মেরামতের দাবি জানায় তারা। প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিক তাঁর স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে ১২০০ টাকা মঞ্জুর করেন এবং ছাত্রাবাসটি মেরামত করার নির্দেশ দেন। এই ছাত্রদের নেতার নাম ছিল খোকা। হ্যাংলা, ছিপছিপে দৈহিক গঠন, তবে সুশ্রী ছেলেটির ভালো নাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান।

সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বঙ্গবন্ধু কখনও দূরে সরে যাননি, ভীতি ও অত্যাচারের মুখেও সর্বদা তিনি সত্য ও ন্যায়ের কথা বলেছেন, শোষিত মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর এ নির্ভীক অবস্থানের কারণে তিনি কেবল বাংলাদেশেই নয়, শোষিত-নির্যাতিত বিশ্বমানব সমাজেও অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের কথা, যেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত–শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন–এসব স্থানে শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়, বিশ্বের শোষিত-নির্যাতিত মানুষ বঙ্গবন্ধুকে গ্রহণ করে নেয় নিজেদের নেতা হিসেবে। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

দেশকে ভালোবাসতেন বলে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছেন মিলিত বাঙালির। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছিল তাঁর মজ্জাগত, মানবিক চেতনায় তিনি সর্বদা ছিলেন উচ্চকিত। তিনি ছিলেন বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারক। মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে মানবপরিচয়। এ কারণে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে তিনি বাঙালির জন্য অসম্মানজনক বলে মনে করতেন। বাংলাদেশ ও বাঙালি সত্তাকে তিনি কী বিপুলভাবে ভালোবাসতেন, তা বোঝা যায় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রদত্ত ভাষণ থেকেই। ওই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের মুখের ওপর তিনি বলেছেন, "আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা।" এ বক্তব্য থেকেই অনুধাবন করা যায়, দেশের জন্য, বাঙালির জন্য, বাংলা ভাষার জন্য বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালোবাসা।

বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ ৩০০টি ভাষণ ৭ খণ্ডে প্রকাশ করে। এসব ভাষণের মধ্যে একটি ছিল স্বাধিকার সম্পর্কে। ভাষণটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিম্নরূপ–

"ষড়যন্ত্রকারীরা জেনে রাখুন, বায়ান্ন সাল আর একাত্তর সাল এক নয়–ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাঁত কী করে ভাঙতে হয় এখন আমরা তা জানি। কারও প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই, আক্রোশ নেই। আমরা চাই স্বাধিকার। আমরা চাই আমাদের মতোই পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বালুচ এবং পাঠানরাও নিজ নিজ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকুন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কেউ আমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে। ভ্রাতৃত্বের অর্থ দাসত্ব নয়। সম্প্রীতি আর সংহতির নামে বাংলাদেশকে আর কলোনি হিসেবে ব্যবহার করতে দেবো না। যারা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধিকারের দাবি বানচালের জন্য বাঙালিকে ভিখারি বানিয়ে ক্রীতদাস করে রাখছে, তাদের উদ্দেশ্য যেকোনো মূল্যে ব্যর্থ করে

দেওয়া হবে। সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি হয়তো আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে মরতেই হয়। জানি না, আবার কবে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের এবং বাংলার সকল মানুষকে ডেকে বলছি, চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন–বাংলার মানুষ যেন শোষিত না হয়, বঞ্চিত না হয়, বাঙালি যেন আর অপমানিত-লাঞ্ছিত না হয়। দেখবেন, শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।

যতদিন বাংলার আকাশ-বাতাস, মাঠ-নদী থাকবে, ততদিন শহীদরা অমর হয়ে থাকবে। বীর শহীদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দুয়ারে দুয়ারে ফরিয়াদ করে ফিরছে–বাঙ্গালি তোমরা কাপুরুষ হইও না, চরম ত্যাগের বিনিময়ে হলেও স্বাধিকার আদায় কর। বাংলার মানুষের প্রতি আমার আহ্বান, প্রস্তুত হোন। স্বাধিকার আমরা আদায় করবই।"

এ ছাড়াও ১৯৭০ সালের ১০ অক্টোবর রেডিও পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবের লিখিত ভাষণ প্রচারিত হয় যেখানে তিনি অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে যেক্ষেত্রে মোটা চালের দাম গড়ে ২০ থেকে ২৫ টাকা সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে ঐ একই চালের দাম ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম মণপ্রতি ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের সরিষার তেলের দাম মাত্র আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি সের তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচিতে যে স্বর্ণে দাম ভরিপ্রতি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সে স্বর্ণে মূল্য ভরিপ্রতি ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা। এভাবেই শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে স্বাধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। তিনি হলেন রাজনীতির কবি। সৃষ্টিশীল চেতনা দিয়ে রাজনীতিকে তিনি নিজের হাতে আকার দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের। তাঁকে নিয়ে কবি শামসুর রাহমানের লেখা 'ধন্য সেই পুরুষ' কবিতার শেষের কয়েকটি পঙক্তি উল্লেখযোগ্য–

ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে
চিরকাল, গান হয়ে
নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা; যাঁর নামের ওপর
কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পাখা মেলে দেয়
জ্যোৎস্নার সারস,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এই মহান পুরুষকে জাতি আজ স্মরণ করছে বিনম্র শ্রদ্ধায়।

রাজু আহমেদ
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, বিএসএমআরএমইউ
ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান, আমেরিকাতে ফুলব্রাইট ফেলো

বঙ্গবন্ধুঃ
মেরিটাইম স্থপতি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ পর্যটন

সৈয়দ রাশিদুল হাসান

"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ১৯৭১ এর ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের শেষ কথাটি দিয়েই যেন শুরু হয়েছিল আমাদের স্বাধীন হওয়ার যুদ্ধ। ২৬ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই শুরু হয় প্রকৃত যুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস বাংলার দামাল ছেলেরা অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে স্বাধীনতার সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনল ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে আরেকটি স্মরণীয় দিন। পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে। কালক্ষেপণ না করেই ১২ জানুয়ারি তিনি তার নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি করলেন। নয় মাসের যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি নতুন দেশে তখন ছিল না কোনো প্রশাসন, কোনো পুলিশ কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা সুসংগঠিত সামরিক বাহিনী, বেসামরিক বিমান এবং অবকাঠামো। যেদিকে তাকানো যায় শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রিজগুলোর জন্য না ছিল রেল বা অন্য কোনো যানবাহন। ছিল না নিজস্ব মুদ্রা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা। সরকারের নিয়ন্ত্রণ, নীতিমালা, শাসনব্যবস্থা কিছুই ছিল না। এর মাঝে ভারতে চলে যাওয়া প্রায় এক কোটির ওপর শরণার্থীর ফিরে আসা, তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করা, আহারের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করা ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে একদম শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছিল। এ যেন এক মহা চ্যালেঞ্জ। ধ্বংসস্তূপ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবার চ্যালেঞ্জ। কারও কাছে মাথা নোয়াবার নয় এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী বঙ্গবন্ধু দেশপ্রেমের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে শুরু করলেন বিধ্বস্ত দেশটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজ। পশ্চিমা বিশ্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো নতুন এই সরকারকে কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসেনি। শুধুমাত্র জাইকা, বিশ্বব্যাংক এবং পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ আমাদের পুনর্গঠনের কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, যা ঐ সময়ে আমাদের চাহিদার তুলনায় ছিল যৎসামান্য।

দেশের এই প্রেক্ষাপটে তখন পর্যটনের উন্নয়নের কথা চিন্তা করাও ছিল অবান্তর। তাছাড়াও আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে বিশ্ব অর্থনীতির মানচিত্রে পর্যটনের কোনো ভূমিকাই ছিল না। তাই অবাক হয়ে ভাবতেও ভালো লাগে, এত চ্যালেঞ্জ, এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর সরকার সেই ১৯৭২ সালের ১২ নভেম্বর মাননীয় রাষ্ট্রপতির ১৪৩ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বিপিসি) প্রতিষ্ঠা করেন। অবাক বিস্ময়ে চিন্তা করি, যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত নতুন এক দেশকে গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, মানুষের মুখের আহার জোগাড় করা, যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলা, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেই মুহূর্তে পর্যটনের বিশাল সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে কীভাবে এই মহান নেতা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা করলেন। একেই বলে দূরদর্শিতা, একেই বলে মহান রাষ্ট্রনায়কের হাইপারমেট্রোপিয়া। কথাগুলো বলছি তার একটা কারণ আছে।

পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তান ভূখণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ট্যুরিজম নামের একটা ছোট্ট বিভাগ ছিল। কিন্তু এই বিভাগের কর্মকাণ্ড খুব একটা সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৯৭০ এর শেষ দিকে পাকিস্তান সরকার বড় বড় বেসরকারি ব্যবসা উদ্যোগীদের নিয়ে একটা কর্পোরেশন গঠন করে এবং ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট এর নাম পরিবর্তন করে ট্যুরিজম সেল গঠন করে। নবগঠিত কর্পোরেশন এবং ট্যুরিজম সেলের হাতে পর্যটন উন্নয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এর একটি ছোট্ট অফিস ছিল মাত্র। এই অফিসের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডও ছিল না।

যাই হোক, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বঙ্গবন্ধু সরকার এই সেল এবং কর্পোরেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বিপিসি) এর সৃষ্টি করেন। অবাক বিস্ময়ে ভাবতে হয়, সে সময় ট্যুরিজম এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড ছিল না। ১৯৭২ সালে আমাদের দেশে মাত্র সাড়ে চৌত্রিশ হাজার পর্যটক এসেছিল। এর মাঝে বেশিরভাগই ছিলেন বিদেশি এনজিও'র কর্মী এবং ভারতীয়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটক। ঐ বছর পর্যটন খাত থেকে আমাদের বিদেশি মুদ্রায় আয় ছিল মাত্র এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সারা বিশ্বের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায়, ১৯৭০ সালের দিকে বিশ্বের আউট বাউন্ড ট্যুরিস্টের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩২ কোটির কাছাকাছি। প্রায় ৫০ বছর পরে এসে আজকের দিনে সমগ্র বিশ্বে পর্যটকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪০ কোটির কাছাকাছি। বর্তমানে বিশ্বে পর্যটন

হল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খাত। আজ থেকে প্রায় অর্ধশত বছর আগে যুদ্ধবিধ্বস্ত এক দেশের মহান রাষ্ট্রনায়কের চিন্তায় কী করে এলো যে পর্যটন এক সময় বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হবে? আমাদের শ্রদ্ধা এই মহান ব্যক্তিটির প্রতি যিনি আমদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন পর্যটনের উন্নতির মাঝেই লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা। শুধু তাই নয়, আমাদের সমুদ্র, নদীর ব্যাপক অবদানের কথা মনে করে দেশের ঐ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম প্রণয়ন করলেন 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪'। এই অবস্থায় নিঃসন্দেহে তিনিই বাংলাদেশের পর্যটনের জনক। তাঁর মাধ্যমেই পর্যটনের প্রথম বীজটি বপন হয়েছিল এই দেশের মাটিতে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে মেরিটাইম ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি বিষয়ে বিগত বছর থেকে এমবিএ প্রোগ্রামে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে শুরু করেছে। সম্প্রতি এখানে মেরিটাইম ট্যুরিজম বিভাগ খোলা হয়েছে। কারণ আমাদের নিকট ভবিষ্যতের বৈশ্বিক অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে ব্লু ইকোনমি'র দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে এখন চলছে উন্নয়নের মহোৎসব। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা পেয়েছি ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের সামুদ্রিক রত্নভাণ্ডার। আমাদের আছে ৭১০ কিলোমিটার সৈকত। ব্লুইকোনমির প্রথম যে পাঁচটি খাতের অসীম সম্ভাবনা আছে তার একটি হলো পর্যটন, যাকে আমরা ব্লু ট্যুরিজম নামে আখ্যায়িত করতে পারি। স্থলভিত্তিক পর্যটন এবং ব্লু পর্যটনের মধ্যে আছে অনেক তফাত। সেখানে আছে ক্রুজিং, ইয়টিং, প্যারাগ্লাইডিং, স্নোরকেলিং, স্কুবা ডাইভিং, সুইমিং, সার্ফিং ইত্যাদি অনেক কিছুই। ট্যুরিজমভিত্তিক এই কর্মকাণ্ডগুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। এ ছাড়াও ট্যুরিজম জিওগ্রাফির দিকে তাকালেও দেখা যায় তুলনামূলকভাবে ট্যুরিজম ব্যবসা রমরমা হয়ে জমে উঠেছে লিটোরাল দেশ সমূহেই। সব কিছু বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম বিভাগ খুলে শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে এই বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, আমাদের পর্যটন শিল্পকে এখনও সেভাবে আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। সরকারের কাছে আবেদন রাখব, পর্যটন খাতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে কী কী বাধা আছে তা দূর করে যোগ্য বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে কীভাবে এই সম্ভাবনাময় শিল্পকে সার্থকভাবে এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে, তা ভেবে দেখার জন্য।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান
বিভাগীয় প্রধান
মেরিটাইম ট্যুরিজম বিভাগ

বঙ্গবন্ধুঃ এক নৌ-স্বপ্নের কাণ্ডারি

ক্যাপ্টেন আরিফ মাহমুদ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের নৌপরিবহন খাত মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। সব সমুদ্রগামী জাহাজ পাকিস্তানিরা নিয়ে যায়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে কোনো সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল না। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা কর্ণফুলী নদীতে প্রচুর ডুবন্ত মাইন স্থাপন করে যার ফলে নদীতে অনেক যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্যিক জাহাজ ধ্বংস হয়ে ডুবে হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর এই সব নিমজ্জিত জাহাজ এবং মাইন কর্ণফুলী নদীকে আর্ন্তজাতিক মহলে অনিরাপদ হিসেবে চিহ্নিত করে। এই কারণে অনেক বাণিজ্যিক জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে নোঙর করতে অনীহা প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালেই মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় কর্ণফুলী নদীকে মাইন মুক্ত করা হয় এবং একইসাথে যুদ্ধের সময় নিমজ্জিত সকল জাহাজ সরিয়ে করে নদীকে নিরাপদ করা হয়। এর ফলে বিদেশি জাহাজগুলো নিরাপদে চট্টগ্রাম বন্দরে আসতে শুরু করে।

তৎকালীন রাশিয়া সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করে। এই সব বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত সোনার বাংলাকে পুনর্নির্মাণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কিছু দিনের মধ্যেই, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বিনামূল্যে ও স্বল্প মূল্যে ১৯টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করে। ১৯৭২ সালের ১০ জুন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ভারত থেকে প্রথম জাহাজ সংগ্রহ করে এবং এই জাহাজের নামকরণ করা হয়, 'বাংলার দূত'। এই জাহাজের মাধ্যমে বিশাল সমুদ্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী বাণিজ্যিক জাহাজের পদচারণা শুরু হয়।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 'বাংলার সম্পদ' নামক দ্বিতীয় বাণিজ্যিক জাহাজ বাংলাদেশের নৌবহরে যুক্ত হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্রের কাছ থেকে মোট ১৯টি জাহাজ সংগ্রহ করে এবং এই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত আরও নয়টি জাহাজ বাংলাদেশের নৌবহরে যুক্ত হয়। এর ফলে আমদানি, রপ্তানি ও ব্যবসা বাণিজ্যে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের উন্নতি হতে থাকে। শুরুতে ব্যবসা বাণিজ্য খুব সীমাবদ্ধ ছিল যার কারণে শুরুতে অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসের মধ্যেই ৮৬টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলার সোনালি আঁশ হিসেবে খ্যাত পাট ও পাটজাত পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি শুরু হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসীমা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে শুরু করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সবকিছুর ব্যাপক অভাব ছিল, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হওয়ার কারণে অভাব ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ইসলামিক সহয়োগিতা সংস্থা, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগদান করে।

জাহাজের অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬২ সালে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে মেরিন একাডেমি স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার এই একাডেমিকে করাচি বন্দরে স্থানান্তর করে এবং চট্টগ্রামের মেরিন একাডেমি পরিত্যক্ত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু এই একাডেমিকে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি নামে পুনরায় চালু করেন। ১৯৭৩ সালে ডেভলপমেন্ট অব মেরিন একাডেমি নামক প্রকল্প চালু করা হয় এর ফলে সত্তর-আশির দশকে মেরিন একাডেমি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে এটি ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির একটি শাখা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ছাত্ররা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক নৌবহরে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আরও অনেক একাডেমির ছাত্র আছেন যারা দেশে-বিদেশে সরকারি-বেসরকারি শিপিং প্রতিষ্ঠানে নীতিনির্ধারক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের বাণিজ্যিক নৌবহরের অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি বড় সম্প্রদায়। এদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশ গঠনে বড় ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এর অধিভুক্ত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এখন বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির সব ছাত্র এই ইউনিভার্সিটি থেকে

৪ বছর মেয়াদি স্নাতক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের মৎস্যসম্পদ আহরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখানে ছাত্রদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আমাদের বঙ্গোপসাগর বিভিন্ন সামুদ্রিক সম্পদে পরিপূর্ণ। তাঁর মধ্যে মৎস্যসম্পদ অন্যতম। অতীতে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের নৌ সীমানা নির্ধারিত ছিল না। আর সেই সময় ভারত ও মিয়ানমারের মৎস্যজীবীরা বাংলাদেশের এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণ মৎস্যসম্পদ আহরণ করেছ, যা আমাদের দেশের জন্য একটা বড় ক্ষতির কারণ ছিল। পরে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের জলসীমা নির্ধারিত হয়। আমাদের দেশের মৎস্য সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও রপ্তানির জন্য এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ অতি জরুরি। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি বর্তমানে এই দক্ষ জনবল তৈরি করছে। এই একাডেমির ছাত্ররা শিক্ষাগ্রহণ শেষে দেশে এবং বিদেশে বড় বড় ট্রলার ও অন্যান্য নৌযানে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করছে। এই সব ছাত্রদের তত্ত্বাবধানে বঙ্গোপসাগর থেকে নানা প্রকার মৎস্যসম্পদ আহরণ করা হচ্ছে এবং দেশের প্রয়োজন মেটানোর পর বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধিভুক্ত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এখন বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির সব ছাত্র এই ইউনিভার্সিটি থেকে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

বঙ্গবন্ধুর বিশেষ আগ্রহে ও তত্ত্বাবধানে ১৯৭৪ সালে আঞ্চলিক সমুদ্র আইন প্রণয়ন করা হয়, যা 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' নামে বিখ্যাত। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ কারণ জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিল প্রথম পাশ হয় ১৯৮২ সালে (UNCLOS 1982) এক্ষেত্রে দেখা যায় সমুদ্র নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী।

মুক্তিযুদ্ধের পর গত হয়েছে অনেক সময়। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অনেক পানি। সারাবিশ্ব এখন সুনীল অর্থনীতির স্বপ্নে বিভোর। এই সুনীল অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে আমাদের তরুণ সমাজ এবং তারাই সুনীল অর্থনীতির সাথে সাথে দেশের অর্থনীতির ও ব্যাপক উন্নতি সাধন করবে। বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে সামনে এগিয়ে যাবে। অদূর ভবিষ্যতে সবার জন্য বাংলাদেশ হবে উন্নয়নের রোল মডেল।

ক্যাপ্টেন আরিফ মাহমুদ
সহকারী অধ্যাপক
মেরিটাইম সায়েন্স বিভাগ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধু

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শামসুল হকের সাক্ষাৎকার

আতকিয়া অসিমা

ডিসেম্বর ২০১৯ এর কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচাকা করতে করতে বেশ কিছু তথ্য পেলাম। একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ক্ষণের একটি কথোপকথন তুলে ধরতে চাইছি।

নাম: বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শামসুল হক
সেক্টর: ১১
এলাকা: টাঙ্গাইল

আমি: আসসালামু আলাইকুম, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের সাথে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য।

তিনি: ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমিও অত্যন্ত আনন্দিত তোমাদের প্রজন্মের সাথে আজকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারছি বলে এবং এ বিষয়ে আমাকে আহ্বান করার জন্য তোমায় ধন্যবাদ।

আমি: আপনার নাম ও পরিচয়?

তিনি: আমার নাম মোহাম্মদ শামসুল হক। আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

আমি: এই বিষয়ক প্রথম প্রশ্ন হলো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আপনার বয়স কত ছিল?

তিনি: তখন আমার বয়স ছিল ১৫ বছর।

আমি: যেহেতু বাঙালিদের সংগ্রাম দীর্ঘ দিনের, আপনি কি ছোটবেলা থেকেই ভেবেছিলেন যে, এই সংগ্রামের একটি ভাগ হবেন?

তিনি: না, তেমন কোনো ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বাংলাদেশের সেই সময়ের প্রেক্ষাপট এমন হয়ে গিয়েছিল যে দেশের ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজি থাকতে পারিনি। তখন মাত্র কলেজে ভর্তি হলাম আমরা এবং দেশের অবস্থার অবনতির কারণে আমাদের জীবনও স্বাভাবিক ছিল না। পাকবাহিনীর হামলার কারণে দেশটি একটি মৃত্যুর গন্তব্যে পরিণত হয়। তখন আমরা শেখ মুজিবুরের ডাকে সারা দিয়ে যুদ্ধে নামি।

আমি: আপনি কোন সেক্টর এবং এলাকায় যুদ্ধ করেন?

তিনি: আমাদের সেক্টর ছিল ১১ নম্বর এবং এলাকা ছিল টাঙ্গাইল। আমাদের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। আমাদের লোকাল কামান্ডার ছিলেন বায়েজিদ আলম।

আমি: আপনি কি যুদ্ধে যাবার আগে কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন?

তিনি: হ্যাঁ, নিয়েছিলাম, আমি যুদ্ধের শুরু থেকে ছিলাম না, যুদ্ধে যোগ দিই ৭ জুলাই ১৯৭১। তখন প্রথমে সখীপুর ক্যাম্পে আমাদের ট্রেনিং করানোর পর আমরা মূলত যুদ্ধে নামি, আমরা ১৫ দিন ক্যাম্পে থেকে অস্ত্রের ব্যবহার, বিভিন্ন কৌশল শিখি। সবাইকে একটা কথাই বেশ জোর দিয়ে বলা হয়, তোমাদের কমান্ডার এখন থেকে তোমাদের মাতা-পিতা, তিনি যা-ই বলবেন মন্দ-ভালো বিবেচনা না করে তাঁর আদেশ অনুসরণ করবে তাঁর কথার অবাধ্য হবে না।

আমি: আপনি কি কারও পরামর্শ নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দান করেন?

তিনি: না কারও পরামর্শ শুনে না, আমাদের বিবেক যখন আমাদের বললো দেশটিকে আমাদেরই স্বাধীন করতে হবে এবং স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ করতে হবে, তখন আমাদের তরুণ মন আর আমাদের আটকে রাখতে পারেনি। সেই দেশপ্রেমের তাগিদেই আমরা যুদ্ধে নামলাম।

আমি: আপনার পরিবার থেকে কি কেউ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন?

তিনি: হ্যাঁ, আমরা তিন ভাই আমার চাচাত খালাত এবং ফুফাত ভাই একত্রে চলে যাই মুক্তিযুদ্ধে, এর মধ্যে একজন সেনাবাহিনীতেই ছিল, তখন তিনি ছুটিতে বাড়িতে আসেন। পরে সেনাবাহিনীতে আর ফিরে না গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন।

আমি: আমরা জানি দেশকে মুক্ত করার চেতনা আপনারা বঙ্গবন্ধু থেকেই পেয়েছেন, আপনি কি কখনও বঙ্গবন্ধুকে স্বচক্ষে দেখেছেন?

তিনি: হ্যাঁ, তাঁকে দেখেছি ১৯৭০ সালে নির্বাচনের আগে, তিনি আমাদের এলাকায় গিয়েছিলেন, আমি দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। তিনি আমাদের স্কুল

মাঠে এলেন, সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম তাঁকে দেখতে, বেশ লম্বা ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে করমর্দন করলেন। তিনি বললেন, "সামনে নির্বাচন, তোমরা যতটা সম্ভব সহায়তা কর।"

আমি: বঙ্গবন্ধুর কোনো ভাষণ স্বচক্ষে দেখেছেন কি?

তিনি: হ্যাঁ, তিনি যখন ১০ জানুযারি ১৯৭২ সালে দেশে ফেরেন, তখন সকল মুক্তিযোদ্ধারা রেসকোর্স ময়দানে জড়ো হই তাঁর ভাষণ শুনতে। খুবই হৃদয়বিদারক ভাষণ দিয়েছিলেন, সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল যখন উনি বললেন যে, "আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং আমাকে তাঁরা কবর দেখায়। কিন্তু আমি তাদেরকে শুধু একটা কথাই বলেছিলাম, তোমরা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর আমার লাশ বাংলার মাটিতে পৌঁছে দেবে।" আমরা বুঝলাম ভয় না পেয়ে তিনি লড়েছিলেন মনোবল নিয়েই। যার ফলে আমরা এই স্বাধীন দেশ পেলাম এবং পাকিস্তান সরকার তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হয়।

আমি: ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ফরিদপুর শহরে আগমন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে বঙ্গবন্ধু স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি স্কুলজীবন থেকেই একজন দক্ষ সম্পাদক ছিলেন এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?

তিনি: একজন মানুষ যখন ছাত্রজীবনে চৌকস হয়ে ওঠে তখন তার কার্যকলাপ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। তাঁর ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া যায়, যেমন সকালের সূর্যের ওপর ভিত্তি করে দিনের অনুমান করা যায়, তেমনি ফজলুল হক সাহেব বঙ্গবন্ধুকে দেখেই উপলব্ধি করেন যে, এই ছেলেই একদিন নিশ্চিত দেশকে নেতৃত্ব দেবে, তাঁর প্রতিভা আছে কাজটি করার। যা পরে সঠিক প্রমাণিত হয়।

আমি: বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন কি?

তিনি: না, তিনি সরাসরি বলেননি। কিন্তু তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।" বাঙালি এই বাণীই মনে ধারণ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে।

আমি: স্বাধীনতার পর স্বাধীন বাংলাদেশে আপনার অবস্থা কেমন ছিল?

তিনি: আমরা যখন যুদ্ধশেষে ফিরে আসি, তখন সারা শরীরে গোটা হয়ে হাত দেওয়ার মতো জায়গা ছিল না। প্রায় ৩-৪ মাস ঔষুধ খেয়ে সুস্থ হতে লাগলাম সবাই এবং ছাত্রজীবনে ফিরে এলাম। অনেকে চাকরিতে গেল, কেউ রক্ষীবাহিনীতে গেল, কেউ সেনাবাহিনীতে, আমরা ভাবলাম পড়ালেখা শেষ করে ডিগ্রি নিই। ১৯৭৫ এ চাকরি পেয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরলাম।

আমি: মুক্তিযুদ্ধ থেকে অন্য কোনো আশা কি ছিল?

তিনি: না, লক্ষ্য একটাই ছিল, দেশকে স্বাধীন করা। কোনো খেতাবের লোভে যাইনি, কিন্তু এখন যা-ই পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ।

আমি: আমরা আপনাকে এবং বাকি সব মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানাই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।

আতকিয়া অসিমা
নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমানের সাক্ষাৎকার

সহিদা আক্তার

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন এদেশের ইতিহাসে কয়েকটি শব্দ ঘুরে ফিরে বার বার জাতির সামনে আসবেই তা হলো বাঙালি ও বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা। বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে জাতির সূর্য সন্তানেরা এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে কিছু সংখ্যক বাঙালি দামাল ছেলে স্বেচ্ছায় রক্তশপথ গ্রহণ করে এবং অস্ত্র হাতে নেয় দেশকে স্বাধীন করার জন্য।

সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম এমনই এক দামাল ছেলের, যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিশোর বয়সেই মাকে ফাঁকি দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই কিশোর মুক্তিযোদ্ধার দুঃসাহসিক সব অভিযানগুলোর কথা শুনব তাঁর মুখেই।

নাম: বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান

সেক্টর: ৭

এলাকা: রাজশাহী

আমি: এত অল্প বয়সে যুদ্ধে যাওয়ার প্রেরণা পেলেন কীভাবে?

তিনি: তখনকার সময়ে খুব বেশি একটা রেডিও ছিল না, আমাদের গোটা গ্রামে শুধু একটা দোকানে রেডিও ছিল। ৭ মার্চের দিন দেখলাম সবাই ঐ দোকানে ভিড় করে কী যেন শুনছে, তারপর আমিও সেখানে গিয়ে শুনলাম শেখ সাহেবের ভাষণ-"প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সবার আলোচনাতেই এটা বুঝতে বাকি রইল না যে, বাংলার আকাশে যুদ্ধের দামামা বাজছে। ৭ মার্চে ভাষণ শোনার পর থেকে শুধু মনের মধ্য একটা কথা বাজতে লাগলো, আমি যুদ্ধে যাবো, দেশকে স্বাধীন করব।

আমি: ২৫ মার্চ রাতে আপনি কী দেখেছেন?

তিনি: ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজশাহী মহানগরী ছাড়াও এর থানা এলাকা যেমন-সারদা, চারঘাট, বাঘাতে হত্যাযজ্ঞ চালায়। সেদিন রাতে বাঘা উপজেলার আলাইপুর, খায়েরহাট গ্রামে পাক সেনারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে।

সেই ভয়ার্ত রাতের পর, ২৬ তারিখে গ্রামের আমবাগানে বসে আমিসহ আরও ১২ জন যুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনা করি। কিন্তু বিপত্তি বাঁধল যখন আমি কথাটি মাকে জানালাম, মা কোলের সন্তানকে কিছুতেই যুদ্ধে যেতে দেবে না। অবশেষে, ২৬ মার্চ গভীর রাতে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই এবং যুক্ত হই বাকি সাথীদের সাথে।

আমি: আপনি যুদ্ধের প্রশিক্ষণ কোথা থেকে পেয়েছেন?

তিনি: আমরা ছিলাম ১৩ জন, সবাই পাশাপাশি গ্রামের। আমাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মনে আছে, দেলোয়ার হোসেন, আবু আফজাল, আব্দুল কাদের। আমাদের ১৩ জনের দল আনুমানিক রাত ১২টায় বাঘা উপজেলার পানিকামড়া থেকে নৌকাযোগে পদ্মা নদী পার হয়ে পরদিন সকালবেলা শিকাপুর ক্যাম্পে পৌছাই। আমাদের প্রথম প্রশিক্ষণ শুরু হয় এই ক্যাম্পে যেখানে এলএমজি, এসএলআর, স্টেনগান ও রাইফেল জাতীয় অস্ত্র কীভাবে চালাতে হয়, কীভাবে কোন পরিস্থিতিতে গ্রেনেড ছুড়তে হয় তা শেখানো হয়েছিল।

ট্রেনিংয়ের সময় আমার রোল ছিল এফএফ ৪১৯৪। শিকাপুর থেকে ট্রেনিং শেষ করে আমরা সাবরামপুর, জমসেদপুর ক্যাম্পে ট্রেনিংয়ের জন্য যাই। দীর্ঘ এক মাস পাঁচ দিনের ট্রেনিং শেষ করে আমরা 'হাই ট্রেনিং' বা 'শেষ ট্রেনিং' এর জন্য যাই শিলিগুড়ি ক্যাম্পে। ২৮ দিনের হাই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমাদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ শেষ হয়। আনুমানিক ২৬ মে আমাদের দল ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে।

আমি: আপনার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কী ছিল?

তিনি: প্রথম অপারেশন হয় মে মাসের শেষের দিকে। আমাদের গ্রুপসহ আরও দুই গ্রুপের সর্বমোট ৩৯ জনের একটা বাহিনী সন্ধ্যার পর পরই

জোতনশী পাকিস্তানি ঘাঁটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলি। আমরা খবর পেয়েছিলাম যে ঘাঁটিতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ গোলাবারুদ আছে এবং পাকসেনারা সংখ্যায় মাত্র ১৮ জন ছিল। এ অপারেশনে দুই পক্ষের মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা গুলিবিনিময় হয় এবং কোণঠাসা হয়ে তারা পালিয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে আমি এ যাত্রায় বেঁচে যাই। আমার উভয়পাশে দুই সহযোদ্ধা গুরুতরভাবে আহত হয়। আমরা এই ঘাঁটি থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করি।

ভারত থেকে আসার পর আমরা একদিনও বসে থাকিনি, দিনের বেলায় গ্রামবাসীদের বাড়িতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতাম এবং অপারেশনের পরিকল্পনা করতাম। গ্রামবাসীরা নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছে। আমাদের গ্রুপ এবং আর একটা গ্রুপ মিলে আমরা বাঘা পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণ করি এবং ৩০ মিনিটের গোলাগুলির পর আমরা ক্যাম্পটা দখল করি। আমার দলের দুই সঙ্গী কাদের ও তপু আহত হয়েছিল। মে মাসের শেষের দিক থেকেই পাকসেনাদের ওপর মুক্তিযোদ্ধারা অবিরাম আক্রমণ চালায় এবং পরাজিত করে। এতে পাকবাহিনীর মনোবল দারুণভাবে ভেঙে পড়ে। ২২ আগস্ট ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে আমাদের ১৩ জনের একটা দল রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার অন্তর্ভুক্ত পাকঘাঁটি মীরগঞ্জ বিওপি আক্রমণ করে এবং দখল করে।

আমি: যুদ্ধের শেষের দিকের অবস্থা কেমন ছিল?

তিনি: অক্টোবর মাসে আমরা রাজাকার বাহিনীর দপ্তর ধ্বংস করার জন্য বেশি সোচ্চার হয়ে উঠি। নভেম্বরের ১/২ তারিখে আমরা ১৩ জন মিলে রাজশাহী মহানগরীর বিহারী ক্যাম্প আক্রমণ করি সন্ধ্যা নাগাদ এবং আমি সেই ক্যাম্প নিজে দখল করি যেখানে এখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্ঠিত। নভেম্বরের ১৬/১৭ তারিখের দিকে আমাদের দল গিয়েছিল রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় রাজাকার, আলবদর, পিচ কমিটির চেয়ারম্যানদের ধরার জন্য এবং গ্রামবাসীর সহায়তায় প্রায় ৩৫-৪০ জন দোসরকে ধরতে সক্ষম হয়েছিলাম। রাজশাহী শহর ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়।

আমি: বঙ্গবন্ধুকে আপনি কেমন দেখেছেন?

তিনি: ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে রাজশাহী থেকে আমরা সকল মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে ঢাকায় যাই এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাকে স্বচক্ষে দেখি।

আমি: স্বাধীনতার পর আপনি কীভাবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন?

তিনি: ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত দুই মাস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জোহা হল' এ ছিলাম। পরে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানীস্বরূপ ১৭০০ টাকা এবং একটি করে সনদপত্র দেওয়া হয়। তারপর আমরা গ্রামে ফিরে যাই।

বর্তমানে বীর কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু গ্যালারি, ক্রীড়া এবং লাইব্রেরির সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সহিদা আক্তার
মেরিটাইম সায়েন্স বিভাগ

বঙ্গবন্ধুঃ
কবিতায় চিরঞ্জীব

নেতার সন্ধানে

শেহ্‌রীনা তাবাস্‌সুম সুপ্তি

উপনিবেশ, পরাধীনতার ভারে নুহ্য
দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বিভক্ত এ জাতি
হতাশার অথৈ সাগরে
কে দেখাবে পথ–শোনাবে আশার ধ্বনি?

এ অন্তিম ক্রান্তিক্ষণে উদিত হলো
এক রক্তিম সূর্য
১৭ মার্চ ১৯২০
ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা
শৈশব কৈশোর–এক একটি প্রতিবাদ,
আত্মত্যাগের মহিমায় পৌরুষদীপ্তে
আগুয়ান।

আবার জাতি পেলো উদিত সূর্যে
কালো মেঘের ছায়া
দ্বি-জাতি তত্ত্বে
পাকিস্তান-হিন্দুস্থান
শুরুতে শকুনিরা ছোবল হানে
এ আমার মায়ের ভাষায়।

কিশোর আবার গর্জে ওঠে
জনতার সাথে জনতা হয়ে
কারাবরণ
এ মাটি তাকে না চিনলেও
চিনেছে হায়েনারা

এরপর রচিত হয় এক একটি ইতিহাস
'৫২,'৬২,'৬৮,'৬৯
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা
তোমার আমার ঠিকানা
তোমার নেতা, আমার নেতা
শেখ মুজিব শেখ মুজিব
'৭০ নির্বাচন জয় বাংলার জয়–

না, হলো না
হায়েনার গ্রাস বারবার গিলে খায়
ঐ লাল সূর্যটাকে
তবু নেতা হারেনি–থামেনি
সে তো মাথা নোয়াবার নয়
এক তর্জনির হুঙ্কার
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

৯ মাস আবার এ সবুজ শ্যামল মা
তাজা রক্তে রঞ্জিত
ক্ষত-বিক্ষত শান্ত মায়ের আঁচল
অতঃপর ফিরে এলো
পুব আকাশের লাল সূর্যটা
যা হারিয়েছিল পলাশিতে।

নেতা, ও নেতা, কোথায় তুমি?
১০ জানুয়ারি '৭২
মায়ের আঁচল পূর্ণ হলো
পুণ্যের পদধূলিতে পূর্ণতায়
বাঙালি ফিরে পেল এক মহান নেতা
শুরু হলো নবজাগরণ
জনতার তারুণ্যে ৫৬ হাজার
বর্গমাইলের পুনর্গঠন
সোনার বাংলা।

হায়! হঠাৎ কী হলো '৭৫
অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা
দেশীয় হায়েনা
নেতা, নেতা নেই
পলাশি থেকে ধানমন্ডি
ডুবে গেল স্বাধীনতার শেষ সূর্যটা
আজন্ম সলজ্জ সাজে সেজেছিল যে বাংলা
সে আর ফিরবে না।

আমি শেখ মুজিবের কথা বলছি
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুর কথা বলছি
যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সমন্বয়ে
এক বাংলার পূর্ণ ইতিহাস

তাই এ জন্মশতবর্ষে
খুঁজে বেড়াই বারবার
নেতাকে যদি ফিরে পাই
নেতার প্রজন্মে–উত্তরাধিকারে।

শেহ্‌রীনা তাবাস্‌সুম সুপ্তি
নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

নাম তাহার বঙ্গবন্ধু

আবদুল্লাহ আল জমি

আমি তোদের জন্মভূমি বলছি,
যার চাদরে জন্মায় যত
সবুজ-সুফলা সুন্দর।

আমি তোদের মাতৃভূমি বলছি,
যার কোলেতে তোমরা বেঁচে থাকো
আর জীবন প্রবাহ ঘটাও।

আমি শ্যামল প্রকৃতি বলছি,
যার উর্বর ভূমির বর্ণ
তোমার চোখ জুড়ায়।

আমি বাংলার বুকে বয়ে চলা নদী বলছি,
যার মিঠে জল
তোমার তৃষ্ণা মেটায়।

তুমি কি ভেবে দেখোনি, "হে বঙ্গসন্তান"!
কী করে আমি এতো প্রাচুর্যপূর্ণ
কী করে তুমি এতো স্বাধীন নিঃশ্বাস নিচ্ছ?
ভেবে দেখেছ কি কখনও?

জানি, তা ভেবে দেখোনি-
কিন্তু আমার অস্তিত্বের সাথে যে জড়িত
তাকে আমি ভুলতে পারি না।

স্মরণ করো বেনিয়া শাসনকে,
যা তোমার পূর্বপুরুষের স্বাচ্ছন্দ্যকে ধ্বংস করেছে,
ডেকে এনেছে বাংলায় দুঃশাসনের ছায়া।

কত অত্যাচার, নিপীড়ন ও জীবনদান-
এবং উনিশটি দশকের বিনিময়ে
পেলাম দুঃশাসন থেকে মুক্তি।

আমি ক্ষণিকের নিঃশ্বাস ছাড়লাম,
ভেবে দেখলাম এবার তোমাদের নিয়ে
সমৃদ্ধির পথে আগাবো।
কিন্তু কণ্ঠরুদ্ধ হলাম,
মুখের বুলি কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে।

সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারেরা এগিয়ে এলো
আমার কণ্ঠ বাঁচাতে-
দিল আত্মত্যাগ।
আবার শুরু হলো কংস অধ্যায়,
পশ্চিমা শুকুনের থাবায়
আটকে গেল দেশ।

আমি ক্লান্ত, দুঃখ ভারাক্রান্ত
অন্তরে কেঁদে যাই...
আর চিন্তামগ্ন হই,
কবে পাব মুক্তি?

আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম
ভেবে বসলাম,
এটাই বুঝি আমার নিয়তি।

ঠিক এমনই মুহূর্তে জন্ম হলো এক কিংবদন্তির
যার অগ্নিকণ্ঠে সমগ্র দেশে হলো
বারুদের ন্যায় ফুলিঙ্গের সঞ্চার

যার বজ্রকণ্ঠের আহ্বানে,
তোমরা জড়ালে এক
রক্তক্ষয়ী কুরুক্ষেত্রে
ঐক্যবদ্ধ বাঙালি-এক মহান নেতৃত্বে
নয় মাসের চূড়ান্ত সংঘর্ষে
বিজয়ী হলো অবশেষে।

তিরিশ লক্ষ তাজা প্রাণের বিনিময়ে,
দু-লাখের সম্ভ্রমহানি ব্যতীত
আস্বাদন করতে পারতে?
এ স্বাধীনতা?

কে জানালো সেই ভূকম্পন সৃষ্টিকারী আহ্বান
জানতে ইচ্ছে করে না, কে সে?

শোনো, নাম তাঁর শেখ মুজিবুর রহমান
ভালোবেসে আমার দামাল ছেলেরা নাম দিয়েছিল
–বঙ্গবন্ধু।

নাম তাহার বঙ্গবন্ধু
বারোটি বছর কাটিয়েছে কারার লোহাতে,
কত অনশন, জেরার পর নির্ঘুম
রাত কাটিয়েছে সে।
দেশমাতৃকার পরাধীনতায় সে হত ব্যথিত
তবুও দমে থাকেনি সে,
গড়ে তুলেছে দুর্বার আন্দোলন আর গণঅভ্যুত্থান।
নিজ জীবনকে উপেক্ষা করে,
জনসম্পৃক্ত হয়ে–
রচনা করেছে এক রক্তক্ষয়ী মহাকাব্য
-মুক্তিযুদ্ধ।

আবদুল্লাহ আল জমি
ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

সেই মহান মানুষ

তাসলিমা আক্তার

খুঁজে দেখো পাবে না কোথাও হাজার বছরের বাঙালিকে
পাবে সবুজ শ্যামল শস্যের দেশে।
দেখেছো, পেয়েছো শ্রেষ্ঠ দিন কোনটি কোনো স্থানে
দেখতে পাবে নদীমাতৃক দেশে।
যুগের শ্রেষ্ঠ পিতা শুয়ে আছে কোথায়?
শুধু পাবে ভাটিয়ালির দেশে।
আগুন ঝরানো বক্তৃতার জনক সাহসিকতার নায়ক
আছে পল্লী মায়ের দেশে।
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে পাবে তুমি
পদ্মা মেঘনা যমুনার দেশে।
বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দানকারীকে দেখতে পাবে
লাল সবুজের পতাকার দেশে
৭ই মার্চ ভাষণ দেওয়ার পুরুষটিকে পাবে
সালাম বরকত জব্বারের দেশে।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দানকারী ব্যক্তিটিকে দেখবে?
দেখতে পাবে কবি নজরুল, রবিঠাকুরের দেশে।
'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন যে মানুষটি তাকে দেখতে চাও?
পাবে এসএম সুলতান, জয়নুল আবেদিনের রং-তুলির দেশে।
৭১,৬৯ আর ছয় দফা দাবি আন্দোলনকারী নেতা তাকে কি দেখবে?
পাবে দেখতে শহিদ মিনার জাতীয় স্মৃতিসৌধের দেশে।
সেই মহান মানুষটি হচ্ছে আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান ...।

তাসলিমা আক্তার
মেরিটাইম ল' অ্যান্ড পলিসি বিভাগ

স্বাধীনতার ধারক

তাসমিম হোসেন সাম্য

অনিরুদ্ধ আকাশ ভেদ করিয়া
দেশের তরে হইয়াছিলেন মরিয়া,
ঢাল হইয়া উর্বর মাটিতে
স্বাধীনতার পথে সজোরে হাঁটিতে,
ভাবিতে হয় নাই যাহার একটিবার,
তাহাকে কি দমিয়ে প্রতিহত করা যায়?
সে যে ছিল নির্ভীক দুর্বার
ওহে সে যে আর কেহ নহে।
অবিসংবাদিত মহান নেতা
পরের ক্রন্দনে ব্যথিত জাতির পিতা
বহমান নদীতে যেমন স্রোতের অবিরাম প্রবাহ,
অগ্নি প্রবল দৃষ্টিতে তাহার স্বাধীনতার মোহ।
বাঙালির ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতির শক্তি
করিতে চাহিয়াছে নিশ্চিহ্ন?
বলি পাক সেনারা! সে তো বড়ই সংকীর্ণ।
শোষকদের নিপীড়ন, অন্ধকারে আচ্ছন্ন স্বার্থ
এক জোট হইয়া, মনোবল শক্ত করিয়া, করিতে হইবে ব্যর্থ।
এইরূপ আহ্বানে যখন মোহিত চারপাশ
স্বাধীন বাংলা বিরাজ করিবে, সেইরূপই অভিলাষ।
৭ই মার্চের গর্জিত ডাক, উত্তাল আহ্বান
দেশমাতার অনঘ সম্মান হইবে নাকো ম্লান।
নিপীড়ন, হাহাকার, অশ্রুসিক্ত মৃত্তিকা যখন
দুর্বলতা নহে, স্বাধীন বাংলার অভিসন্ধি;
সকলে মোরা সবার তরে শোষকদের পরিপন্থি।
সকল আঘাত ঘাত-প্রতিঘাত, কারাভোগের পুনরাবৃত্তি
সকল আঁধার অতিক্রম করিয়া হইয়াছিলেন রোধী।
দেশব্যাপীয়া স্থাপন করিলেন অনন্য শুভ্র কীর্তি
একাত্তরের উদ্দীপনায় যুদ্ধ জয়ের পথিক
একটি ধ্বনিতে একত্রিত দেশ, একত্রিত জাতি
সে যেন এক দুর্বহ বিমল সৌভিক।
একাত্তরের রৌদ্র প্রখর দীপ্ত শিখায়
প্রজ্জ্বলিত বীর মহাশয়
দিয়াছিলেন জাতিকে অভয়;
অর্জিত হইবে স্বাধীন দেশ
হিংস্রতার মেলা হইবে তো এবার শেষ।
অবশেষে আসিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ
অসীম ত্যাগের বাঁধ ভাঙিয়া
বিজয়ের পতাকা উত্তোলিত হইল,
রক্ত অশ্রুর প্রবাহ থামিয়া
বিজয় শিখায় দীপ্ত হইল একত্তর সন।
স্বাধীনতার ধারক হইয়া তুমি রাখিয়াছ দেশের মান;
চূড়ায় স্থাপিত হইয়াছে এদেশের কাঙ্ক্ষিত সম্মান।
বঙ্গবন্ধু একটি নাম, হবে নাকো নিঃশেষ
তোমার স্পর্শে ধন্য মাটি, ধন্য জাতি
ধন্য মোরা, ধন্য দেশ।

তাসমিম হোসেন সাম্য
নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

অমর নক্ষত্র

তাসনুর জাহান

অথচ শুনেছি,
নক্ষত্রেরও নাকি একদিন মরে যেতে হয়।
তবে কি অমর নক্ষত্রের অংশ
সেই একজন বাংলাদেশি?
বিনা অপরাধ ১৯ বছর বয়সেই হাজতবাসে ঘুচেছে যায় নাবলকত্ব।
অনবরত হাজতবাস সত্ত্বেও,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশপ্রেম লালনের দুঃসাহস দেখায় কয়জন।
সে শেখালো আপসকামী স্বভাবের নিকুচি দেয়া।
৫২'তে মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার প্রস্তাব এলো
তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানানো কি তাকে সংগ্রামী করে তোলে না?
স্বার্থহীন কণ্ঠে ছয় দফা পেশ কি নিতান্তই কোনো ব্যাপার?
বরং হাতেখড়ি করালেন।
আন্দোলনের নতুন রূপরেখা আঁকার।
গণঅভ্যুত্থান ঘটলো ৬৯'এ।
সাধারণ লোকের অধিকার নিশ্চিতের চেষ্টা কি তারই নয়?
আর '৭১?
বোবা মাটিও কি হাহাকার করে জানান দিচ্ছে না
রক্তাক্ত নয় মাসের কথা?
এই মানুষটার অবদানের কথা?
সবশেষে প্রাপ্তি!
৭৫'কে হতে হলো তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী।
তাই বলে আমি তাকে ভুলিনি,
আমরা তাকে ভুলিনি,
যে এই বাংলার স্থপতি,
সেই বঙ্গবন্ধু,
সেই শেখ মুজিবকে কি ভোলা যায়?

তাসনুর জাহান
ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

শতবর্ষী প্রাণ

তানজীম জাহান

বঙ্গবন্ধু একটি নাম প্রেরণা জোগায় প্রতিটি প্রাণে
বঙ্গবন্ধু একটি নাম ভালোবাসা সকলে জানে,
তোমরা কি জানো, মহান এই নেতার গুণাবলি?
চলো আজ সেই কথাগুলো চারণ করি।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল সেই টুঙ্গিপাড়ায়
সেখানে কতশত ছেলেরা কত ঘুড়ি ওড়ায়,
যখন বঙ্গবন্ধু মহান নেতা তখন
তাঁর মূল্যবান সময় কারাবন্দিতে কাটায়।

জনগণের জন্য লড়ে, করেছেন অধিকার আদায়
ফাঁসির দড়িকে তুচ্ছ করে,সংগ্রাম করে
জনগণের অন্তপ্রাণে থেকে
হাসি ফুটিয়েছেন সকলের মুখে।

শুনতে কি চাও আদর্শবাদী নেতার কথা?
যিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন সকলের তরে!
রাজনৈতিক সেই মহান নেতা
বঙ্গবন্ধু তাই তো দেশের সেরা।

দেশকে স্বাধীন করে, এসেছেন এই বাংলায় ফিরে
তুলে নিয়েছেন শত শত কাজ নিজ হাতে ধরে,
উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে যেই করেছে যাত্রা শুরু
তখনই হায়েনারা ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নেয় প্রাণটুকু।

যিনি ছিলেন আমাদের মহান নেতা
তিনি ছিলেন দেশ ও জাতির সেরা,
শুনেছো কি তোমরা একটি নাম?
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তানজীম জাহান
মেরিটাইম ল' অ্যান্ড পলিসি বিভাগ

স্বাধীনতার কবি

মো. মাকসুদুর রহমান

কাব্যের দেশ বাংলাদেশ।
কবির দেশ বাংলাদেশ।
আমাদের কবিতাগুলো
দেশমাতার মতোই স্নিগ্ধ আর স্নেহপূর্ণ।
তবে কি আমরা ভুলে গিয়েছি
সেই কবির কথা?
যার বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদী কবিতায়
দেশমাতা আজ স্বাধীন।
যার কবিতার স্পর্শে
আমরা নতুন স্বপ্নে বাঁচতে শিখেছি।
দেখেছি স্বাধীনতার নতুন সূর্য।
না...
আমরা ভুলিনি সেই কাব্য,
বাঙালি সেই কাব্য ভুলতে পারে না।
কবির সেই কাব্যটিই তো
এ জাতির অস্ত্র,
স্বাধীনতার প্রেরণা
আর স্বপ্নের উৎস।
এটা সেই কাব্য
যার প্রতিটা শব্দ,
বুলেটের মতো
বিদ্ধ করেছিল পাক শাসকদের।
যার প্রতিটি বাক্য; স্বাধীনতার
প্রেরণা দিয়েছিল দেশের মানুষদের।
কে তিনি?
কী তার পরিচয়?
তিনি আর কেউ নয়,
তিনি জাতির পিতা।
আমাদের স্বাধীনতার কবি।
তিনি বাঙালির
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

মো. মাকসুদুর রহমান
মেরিটাইম ল' অ্যান্ড পলিসি বিভাগ

বীর বাঙালি

মুশফিকা মাফরুহা ঐশী

আমরা অথৈ জলে ভেসে আসা কোনো জাতি নই,
আমরা অপরাধ দেখে মুখ লুকিয়ে থাকা কোনো জাতি নই,
আমরা ভাইয়ের রক্তের দাম দিয়ে শোধ করা জাতি।
আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া
বীর বাঙালি জাতি।
আমরা সে জাতি–
যে জাতি মা-বোনের সম্ভ্রম রক্ষায়
বুক পেতে দেয় রাইফেলের সামনে।
আমারা সে জাতি–
যে জাতি বাবা-ভাইয়ের জীবন রক্ষায়
বেয়নেটের হাজার আঘাত পেতে কুণ্ঠাবোধ করে না।
আমরা সে জাতি–
যে জাতি দেশকে বাঁচাতে
কলম ছেড়ে অস্ত্র ধরে।
আমরা সে জাতি–
যে জাতি শত্রু প্রতিরোধে
কলম আর তুলিকেও ব্যবহার করে অস্ত্রের মতো।
আমরা সে জাতি–
যে জাতি একজন পথ প্রদর্শকের ওপর আস্থা রেখে
নয় মাসেই ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য।
হ্যাঁ;
আমরা সেই বাঙ্গালী জাতি
আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে
মুক্ত করে আনা জাতি।
আমরা 'জয় বাংলা' বলে
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া
বীর বাঙালি জাতি।

মুশফিকা মাফরুহা ঐশী
মেরিটাইম ল' অ্যান্ড পলিসি বিভাগ

স্বাধীনতা, তুমি এলে

শিফাজ আহমেদ

আরেকটা নতুন ভোর হয়;
দেখি রক্তিম আভা তোমার মুখে,
জীবনের অত্যাচার, দুঃখ-কষ্ট ভুলে রই
তোমাকে পাবার কৃত্রিম সুখে।

বহিরাগত এসেছিল তোমায় হরণে;
সাধ্য ছিল না বাধা দেবার–জানি,
জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে নেমেছিলাম
বিজয়ীর হবে তুমি...

মানুষ-অমানুষ শিয়াল আর শকুনে,
শরীর ক্ষত করা বুলেট আর আগুনে;
নির্ঘুম রাতে মনে ধরেছিল ভয়,
ভেবেছিলাম তোমাকে পাওয়ার আশা
মরিচিকার মতো কিছু নয়...

তবু প্রত্যাশা করে তোমার হাসিমুখের
আঘাতের বদলে আঘাত করে,
রক্তের বদলে রক্ত–
প্রতিহত করে শত আঘাত
ওদের করেছি জব্দ...

মুক্তির নিশান আকাশে মেলে,
নতুন দিনের নব আলো জ্বেলে,
শত ত্যাগ আর প্রতীক্ষার দিন ফেলে
সেই তো তুমি এলে...

নয় মাস গর্ভে লালন করে,
শত অত্যাচার-যন্ত্রণা সহ্য করে,
নবজাত বাংলা নিয়ে
সেই তো তুমি এলে...

শিফাজ আহমেদ
মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার বিভাগ

মাকে ভালোবাসি

দোলা ওয়াহিদ

আমি মাকে ভালোবাসি
যখন গভীর রাতে খানসেনারা মায়ের সন্তানদের ছিন্নভিন্ন করে
আমার যাত্রা ঐ কালো রাত দূর করবো বলে।

যখন হায়েনারা মায়ের ছেলেদের উপর গুলি চালায়,
মায়ের ভাষা এই মা থেকেই কেড়ে নিতে চায়
আমার যাত্রা ঐ দস্যু তাড়াবো বলে।

যেতে পথে,
গ্রামের পর গ্রাম দগ্ধ, লুণ্ঠিত
শত সহস্র শহীদদের রক্তে রঞ্জিত
আমার মায়ের বুক
আমার যাত্রা তাই দীপ্তময় প্রতিশোধে উদ্ভাসিত
আমি মাকে ভালোবাসি
আমি যে মায়ের লক্ষ্মী ছেলে।

তুমি মাগো, ভেবো না।
এই নিকষ কালো রাত ভেদ করে
যেদিন ভোর হবে।
যেদিন স্বাধীনতার সূর্য উঠবে
সেদিন আমি যাত্রা থামিয়ে তোমার কোলে ফিরব।
মাগো,
তুমি ভেবো না!
আমাদের রথের সারথি
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

দোলা ওয়াহিদ
ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

বঙ্গবন্ধুর কথা

পি এম কে হাসান সিদ্দিকী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তুমি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তোমার মতো এত মায়া দিয়ে এই বাংলাকে কখনও কেউ ভালোবাসেনি,
তোমার মতো কেউ বলেনি, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা,
বাংলার মাটি আমার স্থান।

তুমি বঙ্গবন্ধু, তুমি বাংলার বন্ধু,
তুমি ধনী-গরিব, হিন্দু-মুসলিম, ছাত্র-কৃষক-বুদ্ধিজীবী, সব বাঙালির বন্ধু।

তুমি পিতা, বাঙালি জাতির পিতা,
তুমি পিতা একাত্তরের সব বীরাঙ্গনার।
তোমার মতো কেউ বলেনি, "বীরাঙ্গনাদের পিতার নাম জিজ্ঞেস করলে বলে
দিও, তাদের পিতা শেখ মুজিবুর রহমান, ঠিকানা ধানমন্ডি ৩২।"

রেসকোর্সে আকাশে-বাতাসে আজও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় তোমার
বর্জকণ্ঠ ভাষণ।
মেঘনা পাড়ের মফস্বল শহরের এক বাসায়,
টেলিভিশনের সামনে বসা ছোট্ট ছেলেটা সেদিন
অঝোর ধারায় কেঁদেছিল তোমার ভাষণের প্রতিটি কথায়।

ভাষণ শেষে দৌড়ে গিয়ে মা'কে বলেছিল,
"মা আমি মুজিব হবো,
আমি যুদ্ধে যাবো মা, আমি যুদ্ধে যাবো।
পাকিস্তানি হায়নাদের হাত থেকে আমার বাংলাকে আমি মুক্ত করবো মা।
আমি যুদ্ধে যাবো।"

মা হেসে কপালে চুমু এঁকে দেয় সেদিন,
তারপর বলতে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টার কথা।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির কথা।
বাঙালির বন্ধুর কথা,
তর্জনী উঁচিয়ে আমৃত্যু বাঙালির অধিকার নিয়ে কথা বলা বঙ্গবন্ধুর কথা।

পি এম কে হাসান সিদ্দিক
মেরিটাইম সায়েন্স বিভাগ

তরুণ প্রজন্মের চেতনায় বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন, ছাত্ররাজনীতি ও তরুণ প্রজন্মের অঙ্গীকার

মো. বায়েজীদ মাহমুদ

স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি, তাই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একটি অবিচ্ছেদ্য নাম। যতদিন বাংলাদেশের মানচিত্র থাকবে, যতদিন বাংলাদেশের ইতিহাস থাকবে ততদিন এদেশের মানুষের মনে-প্রাণে অবিনশ্বর হয়ে বঙ্গবন্ধু থাকবেন। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্ম নেওয়া এই মহান ব্যক্তিত্ব আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের পথিকৃৎ হিসেবে, মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সারাজীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করে যাওয়া মানুষটি আজও বাংলার প্রতিটি ধুলিকণা ও মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে যেন মিশে আছেন। বাংলার স্বাধীনতা, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালিরূপে তিনি থাকবেন চির জাগ্রত, চির ভাস্বর।

সভ্যতার শুরু থেকেই বারবার মানবতা হয়েছে ভূলুণ্ঠিত, বেড়েছে শোষক ও শোষিতের ব্যবধান, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে শোষণের মাত্রা, হোক সে প্রাচ্য কিংবা তার বিপরীত গোলার্ধ। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের ওপর অমানুষিক নির্যাতন বন্ধে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন পড়েছিল যেমন একজন মার্টিন লুথার কিং বা ম্যাল্কম ম্যাক্সের, ঠিক তেমনি বাঙালিদের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন বজ্রকণ্ঠধারী মহানায়ককে। তিনি হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু একদিনেই গড়ে ওঠেননি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর অসীম গুণগুলো গড়ে উঠেছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি মুসলিম সেবা সংঘ নামে একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টির চাল বিক্রি করে গরিব ছেলেদের বই, পরীক্ষার খরচসহ অন্যান্য খরচ বহন করতেন। পরবর্তীতে তিনি এই সেবা সংঘের সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। 'মুষ্টির চাল' তুলে গরিব ছাত্রদের পড়াশোনার খরচ চালানোর যে উদাহরণ তিনি গড়েছিলেন তা এখনও অনন্য নজির হয়ে আছে। আমাদের এই অঞ্চলে ১৯৪৩ সালে 'ছিয়াত্তরের মনন্তর' নামে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেই সময়ে বঙ্গবন্ধু দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে ছিলেন। এ বিষয়ে তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "হোস্টেলে যা বাঁচে দুপুরে ও রাতে ভুক্ষদের বসিয়ে ভাগ করে দেই। শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন, আমি লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষ-আক্রান্তদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম।" এই হলেন বঙ্গবন্ধু, এই হলো তাঁর আদর্শ। যিনি মানুষের সেবা করতে গিয়ে নিজের কথা না ভেবে মানুষের পাশে গিয়ে তাঁদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। যা আজকের সমাজে নেই বললেই চলে। জাতির জনক এই দেশের মেহনতি ও গরিব মানুষের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট করলে বঙ্গবন্ধু তাতে সমর্থন দেন। কর্মচারীদের ওই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ এনে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জরিমানা করে। সারাজীবন সাদামাটা জীবনযাপন এবং উচ্চ আদর্শ ধারণ করা এটাই হলো বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ পরবর্তী শাসক গোষ্ঠীদের বিকৃত ইতিহাস রচনার ফলে তখনকার তরুণ প্রজন্মের একটি বিশাল অংশের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে কেন যেন এক ধরনের ধূম্রজাল তৈরি হয়েছিল। তারা জানতো না মুক্তিযুদ্ধের সঠিক পটভূমি কী ছিল, কেন দেশ স্বাধীন হওয়া জরুরি ছিল, তারা জানত না বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ভূমিকার কথা। স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি পরবর্তীতে ক্ষমতায় এসে এই ধূম্রজাল কাটাতে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতির মুক্তি–এ দুটি যে একই সূত্রে গাঁথা তা তরুণ প্রজন্মের কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

বাঙালি জাতির মুক্তির দীর্ঘ সংগ্রাম নানা পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছে। অধিকার প্রাপ্তির, পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশের অভিব্যক্তি মানবিক চেতনা লাভের এবং সব ধরনের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি অর্জনের নানা আন্দোলন সমন্বিত ও একীভূত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের মতো ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। এগুলো সব মিলে তৈরি হয় একটি প্রতিভাস–যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধি পেয়েছেন জনতার মঞ্চে। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন এবং ছাত্ররাজনীতি নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি দেখতে পাবো যে, তিনি খুব সুচিন্তিতভাবেই তাঁর

ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ ছিল অসাধারণ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর নেতৃত্বের প্রতি ছাত্রকর্মীরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ১৯৪২ সালে তিনি সাফল্যের সাথে এন্ট্রান্স (এসএসসি) পাস করার পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন। বঙ্গবন্ধু এই বছরই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ছোটবেলা থেকেই সব সময়ই তিনি ছিলেন ছাত্রদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার। তিনি স্কুলে থাকাকালীন ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শনে এলে বঙ্গবন্ধু স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং ছাত্রদের পক্ষ থেকে তা সারাবার দাবি উত্থাপন করেন। একইসাথে তিনি স্কুলের জন্য ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার দাবিও করেন। এই ঘটনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি তিনি ছোটবেলা থেকেই কী পরিমাণ সৎ সাহসের অধিকারী ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম ছাত্রলীগ, যা বর্তমানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ বলে আমরা চিনি। '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর আইয়ুব খানের মার্শাল ল' বিরোধী প্রতিবাদ, '৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬ এর ছয় দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনকালীন ভূমিকা, '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই সংগঠন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল হাতিয়ার হিসেবে অংশ নিয়েছিল। যে সময়ে যে পটভূমিতে ছাত্রলীগ গঠিত হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত, যা জাতীয় রাজনীতিতে একটি গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তিনি যে দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার প্রয়োগ দেখিয়েছেন তাঁর সেই অবদান অনস্বীকার্য। ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ক্রমান্বয়ে জাতীয় রাজনীতির কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ এবং সম্পৃক্ত হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে থাকেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর জন্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে উত্তরণকাল। তিনি একদিকে ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন, অপরদিকে জাতীয় ভাবে প্রয়োজনীয় সমস্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। এভাবে আস্তে আস্তে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির আশা ভরসা অর্জন করতে থাকেন। নিপীড়িত জনগণকে সাথে নিয়ে মুক্তি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। বস্তুত সমাজ ও পরিবেশ তাঁকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম করতে শিখিয়েছে। তাই পরবর্তী জীবনে তিনি কোনো শক্তির কাছে–সে যত বড়ই হউক না কেন–আত্মসমর্পন করেননি; মাথা নত করেননি।

টুঙ্গিপাড়ার সেই দুরন্ত কিশোর শেখ মুজিবের নাম শুধু টুঙ্গিপাড়ায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর নাম ছড়িয়ে গেছে সারা বাংলায়, সারাবিশ্বে। পরিণত বয়সে তিনি হয়ে উঠেছিলেন শোষিত, বঞ্চিত গণমানুষের নেতা। বিশ্বাস ও আস্থার জায়গা। স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর সঠিক নেতৃত্ব এবং আহ্বানের কারণেই একাত্তরে বাংলার দামাল ছেলেরা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। নিজস্ব একটি পতাকা ও একটি মানচিত্র নিয়ে গর্ব করার সুযোগ পাই আমরা। তাঁর অশেষ অবদান এবং আত্মত্যাগের জন্যই তিনি আজ আমাদের কাছে জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি। সুন্দর সুখী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হোক তরুণ প্রজন্মের অঙ্গিকার। তিনি এক অনির্বাণ শিখা, যে শিখা কোনোদিন নিভে যাবে না। তারুণ্য শ্রদ্ধায় শতাব্দীর মহানায়ক, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেগে থাকবেন তাঁর স্বপ্নের সবুজ শ্যামল সোনার বাংলায়।

মো. বায়েজীদ মাহমুদ
ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি

সামিউল হক

একটি সদ্যস্বাধীন দেশের উন্নতির মূল নিয়ামক হলো সে দেশের পররাষ্ট্রনীতি। পররাষ্ট্রনীতির ওপর ভিত্তি করে সে দেশের প্রতি অন্যান্য দেশের ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি, সাহায্য-সহযোগিতার প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় নির্ভর করে। পৃথিবীর অনেক দেশ দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধায় পড়ে। আমরা এদিক থেকে অনেক ভাগ্যবান। কারণ আমাদের মাথার ওপর বটবৃক্ষের ছায়ার মতো একজন বঙ্গবন্ধু ছিলেন।

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী নয় মাস, ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করি আমাদের স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের দিকে চোখ রাঙাচ্ছিল বিশ্বের পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলো। তারপরেও বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের ওপর ভর করে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের সমীহ আমরা অর্জন করেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের আগেই আমরা স্বীকৃতি অর্জন করেছিলাম ভুটান ও ভারতের কাছ থেকে। বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বরণের আগপর্যন্ত আমরা পেয়েছি ১১৫টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান অন্যতম। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২-এ লন্ডনে অবতরণের পর থেকে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় জনসভায় ভাষণ প্রদান পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৫০ ঘণ্টা। কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড ছিল চমকপ্রদ। সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই আশ্চর্য সাবলীলতায় তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি-কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিই ঠিক করে দিয়েছিলেন–'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়'। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য লাভের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতির সংস্কারসাধন ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রধান লক্ষ্য। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ সালে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সফরের সময় বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত চট্টগ্রাম বন্দরে মাইন অপসারণ ও নৌচলাচল উপযোগী করার জন্য সোভিয়েতের সাহায্য চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন, যার কারণে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন ও সম্প্রসারণের জরুরি কার্যাবলি যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বলয়ে অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ইত্যাদি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। কিন্তু তিনি সব সময় নিজ দেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। এই ব্যাপারে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৭১-৭৫ এই দীর্ঘ সময় সৌদি আরবের কাছে বাংলাদেশ নামক কোনো দেশের অস্তিত্ব না থাকায় বাংলাদেশিরা হজ করতে যেতে পারছিলেন না। বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ১৯৭৩ সালের দিকে ইন্দিরা গান্ধী একটি অর্ডন্যান্স পাশ করেন, যেখানে বলা হয় বাংলাদেশিরা ভারত থেকে হজযাত্রা করতে পারবে। কিছু মানুষ এভাবে হজ পালন করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদর্শনসহ অন্যান্য জটিলতায় এই ব্যবস্থা টেকসই হয়ে ওঠেনি। বঙ্গবন্ধু সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পরেন। অনেক কূটনৈতিক আলোচনা সত্ত্বেও সৌদি সরকারের নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আল জেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে চতুর্থ ন্যাম সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু। বৈঠক চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সালের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কথোপকথনের মূল অংশ ছিল নিম্নরূপ–

বাদশাহ ফয়সাল: আমি শুনেছি যে, বাংলাদেশ আমাদের কাছে কিছু সাহায্য আশা করছে। আপনি আসলে কী ধরনের সাহায্য চাচ্ছেন। আর হ্যাঁ, যেকোনো ধরনের সাহায্যের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু পূর্বশর্ত আছে।

বঙ্গবন্ধু: ইওর এক্সেলেন্সি। আশা করি, আমার ব্যবহার ক্ষমা করবেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমার মনে হয় না বাংলাদেশ ভিক্ষার জন্য আপনার কাছে হাত বাড়িয়েছে।

বাদশাহ ফয়সাল: তাহলে আপনি সৌদি আরবের কাছে কী আশা করছেন?

বঙ্গবন্ধু: বাংলাদেশের পরহেজগার মুসলমানরা পবিত্র কাবায় গিয়ে ইবাদত করার অধিকার দাবি করছে। যদি ইবাদত পালনের জন্য আপনার কোনো পূর্বশর্ত থেকে থাকে, তাহলে আপনি তা বলতে পারেন। আপনি পবিত্র কাবা শরিফের তত্ত্বাবধায়ক। বাঙালি মুসলমানদের কাছে আপনার স্থান অনেক উঁচুতে। একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরই সেখানে ইবাদত করার অধিকার রয়েছে। সেখানে ইবাদত পালন করায় কোনোপ্রকার শর্তারোপ করা কি ন্যায়সঙ্গত? আমরা সমঅধিকারের ভিত্তিতে আপনার সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই।

বাদশাহ ফয়সাল: কিন্তু এটা তো কোনো রাজনৈতিক আলোচনা হলো না। দয়া করে আমাকে বলুন আপনি সৌদি আরবের কাছে আসলেই কী আশা করছেন?

বঙ্গবন্ধু: ইওর এক্সেলেন্সি। আপনি জানেন যে, ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। আমি জানতে চাই, কেন সৌদি আরব স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি?

বাদশাহ ফয়সাল: আমি অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে জবাবদিহিতা করি না। তবু আপনাকে বলছি, সৌদি আরবের স্বীকৃতি পেতে হলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে Islamic Republic of Bangladesh করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু: এই শর্ত বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না। বাংলাদেশের জনগণের অধিকাংশ মুসলিম হলেও, আমার প্রায় এক কোটি অমুসলিমও রয়েছে। সবাই একসাথে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে, ভোগান্তিতে পড়েছে। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই নন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। ইওর এক্সেলেন্সি, ক্ষমা করবেন, আপনার দেশের নামও তো Islamic Republic of Saudi Arabia নয়। বাদশা ইবনে সৌদের নামে নাম রাখা হয়েছে Kingdom of Saudi Arabia। আমরা কেউই এই নামে আপত্তি করিনি।

(www.bangabandhu.com, www.millenniumpost.in)

বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সক্রিয় ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বিশেষভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেন। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এবং সেই দেশের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান জে এন দীক্ষিত তাঁর Liberation and Beyond বইটিতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ওপর কিছু আগ্রহোদ্দীপক মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার পর পরই ভারত বাংলাদেশকে দুটি সমুদ্রগামী জাহাজ ও দুটি ফকার ফ্রেন্ডশিপ উড়োজাহাজ অনুদান হিসেবে দিতে চেয়েছিল। কিন্তবাংলাদেশকে নিয়ে শেখ মুজিবের সম্মানবোধ এতটাই প্রবল ছিল যে দীক্ষিতের কথামতো তিনি এই যানগুলো অনুদান হিসেবে গ্রহণ না করে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিয়ে ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দীক্ষিত আরও লিখেছেন, শেখ মুজিব বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে গঙ্গার পানি বণ্টন ও ছিটমহল হস্তান্তরের প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেন এবং ভারতের দখল করা পাকিস্তানি সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশকে ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর ভারতীয় বাহিনী যাতে দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় সেজন্য ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেন।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি বিশেষ দিক ছিল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে যোগদান করা। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও কমনওয়েলথে যোগদান করে বাংলাদেশ। ১৯৭৩ ও ১৯৭৫ সালে অটোয়া ও কিংসলি কমনওয়েলথ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসিতে যোগাযোগ করে এবং সে বছরই লাহোরে ওআইসির সম্মেলনে যোগদান করেন। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি সফলতা হলো জাতিসংঘে যোগদান করা। যদিও ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের পক্ষে চীনের ভেটোর কারণে পূর্ণ সদস্য হতে দেরি হয়েছিল বাংলাদেশের। ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে চালনা বন্দর (বর্তমান মোংলা বন্দর) এর জন্য সহায়তা প্রদান করে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে এবং সে বছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান করে বাংলা ভাষার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় IMF, ILO, WHO, IDB, World Bank, UNO, UNESCO, FAO ইত্যাদি সংস্থায় বাংলাদেশ যোগদান করে।

বঙ্গবন্ধু পররাষ্ট্রনীতিতে এতই কৌশলী ছিলেন যে যুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য হন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। ফিদেল ক্যাস্ত্রো তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি।" সমগ্র বিশ্বে তিনি ছিলেন একজন আইকন।

মোঃ সামিউল হক
ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

বঙ্গবন্ধু ও আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা

সুদীপ্ত রায়

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশদের রাজত্ব শেষে পাকিস্তান নামে একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান (পরে বাংলাদেশ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ (যেমন পাট) আসত পূর্ব পাকিস্তান থেকে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা আনুপাতিক ছিল না। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই ১৮ বছর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বাঙালি সীমাহীন বঞ্চনার শিকার হয়। বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ ১৮ বছর প্রদেশ বা কেন্দ্রে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারেনি। প্রশাসনিক কাজে বাঙালিদের নিয়োগ দেওয়া হতো না। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। কিন্তু প্রায় সমস্ত অর্থ ব্যয় হতো পশ্চিমাঞ্চলের জন্য। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে আর বৈদেশিক ঋণের বোঝা চাপানো ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ঘাড়ে। নানা অযৌক্তিক অজুহাতে সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ দেওয়া হতো না। পাকিস্তানি শাসন, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বে লাহোরে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সব বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয় ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দিন অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটিতে ৬ দফা উত্থাপন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রোডম্যাপ মূলত রচিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা থেকেই। এটি ছিল রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের ইতিহাসে ছয় দফা এতটাই গুরুত্ব বহন করে যে, এই কর্মসূচিকে বলা হয় বাঙালির মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের ইতিহাসে ছয় দফার ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবিসমূহ–

দফা-১: শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং এর ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

দফা-২: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যথা–দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

দফা-৩: মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুটির যেকোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে–

(ক) সমগ্র দেশের জন্যে দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

অথবা

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

দফা-৪: রাজস্ব, কর, বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর নির্ধারণের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সব রকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

দফা-৫: বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের পৃথক পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলোর আওতায় থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা

সর্বসম্মতভাবে নির্ধারিত হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোই মেটাবে।

(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে শুল্ক বা করজাতীয় কোনোরকম বাধা-নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

দফা-৬: আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

পরিশেষ

ছয় দফার মূল বক্তব্য ছিল, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ছাড়া সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি পৃথক ও সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। সরকারের কর, শুল্ক ধার্য ও আদায় করার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকাসহ দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা হিসাব থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানেরর প্রতিরক্ষা ঝুঁকি কমানোর জন্য এখানে আধা-সামরিক বাহিনী গঠন ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয় দফা দাবির মুখে পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খান বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, ছয় দফা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধুর এই ছয় দফায় পাকিস্তানি শাসকের ভিত এতটাই কেঁপে গিয়েছিল যে 'আপত্তিকর বক্তব্য' দেওয়ার অজুহাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে ১৯৬৯'র ২২ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ একটানা ৩৩ মাস কারাবন্দি ছিলেন প্রিয় নেতা। বঙ্গবন্ধুর মোট ১৪ বছরের কারাজীবনে এটাই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ কারাবাস। ১৯৬৬ সালের ছয় দফার ভিত্তিতে ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান ব্যাপকতা পায়। আর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ছয় দফার ভিত্তিতেই স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। মূলত ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, ছয় দফার বাস্তবায়ন ছাড়া বাঙালির জাতীয় মুক্তি সম্ভব নয়। তাই এই অকুতোভয় বীর দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পেরেছিলেন, "সরাসরি রাজপথে যদি আমাকে একা চলতে হয়, চলব। কেননা ইতিহাস প্রমাণ করবে বাঙালির মুক্তির জন্য এটাই সঠিক পথ।" পরে ছয় দফা দাবির সাথে আরও কিছু দাবি যোগ করে ১১ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামে বাংলার ছাত্রসমাজ। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও সেই আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন দেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান বিদায় নেন। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সব রাজবন্দির মুক্তির পর বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়।

ছয় দফা দাবি ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। ১ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক সরকারের প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্বনির্ধারিত জাতীয় পরিষদ সভা স্থগিত করলে বাংলার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আসে। ছয় দফার দাবি পরিণত হয় এক দফার দাবিতে। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষক শ্রেষ্ঠ কবিতা শোনালেন–"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ছয় দফার স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক। প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় তিনি চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

সুদীপ্ত রায়
ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

জন্মশতবর্ষে মৃত্যুহীন প্রাণ বঙ্গবন্ধু

রাসনুন মেহনাজ

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এই কবিতাটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবময় জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি। যিনি মানুষের সুখ-দুঃখের কথা ভেবে নিজের জীবনকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতির মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সংগ্রামে অনেক ব্যথা-বেদনা, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস রয়েছে। মহান ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহৎ অর্জন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জীবন বাংলাদেশের আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো ছিল না। তাই অন্য সবার মতো তিনি জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে পারেননি, কারণ জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি জেল হাজতে কাটিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের ৪ হাজার ৬৮২ দিন জেলে কেটেছে। সেই দিনগুলোতে কেমন কাটতো বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন? এই প্রশ্নের উত্তরটি বরং জেনে নেই বঙ্গবন্ধুর ভাষায় তাঁরই লেখা 'কারাগারের রোজনামচা' বই থেকে।

"১৭ মার্চ ১৯৬৭। শুক্রবার আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই, বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটি উপহার দিয়ে থাকতো। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধহয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্ম দিবস! দেখে হাসলাম। মাত্র ১৪ তারিখে রেণু ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেখতে এসেছিল। আবার এত তাড়াতাড়ি দেখা করতে অনুমতি কী দেবে? মন বলছিল, যদি আমার ছেলেমেয়েরা ও রেণু আসত ভালোই হতো। ১৫ তারিখেও রেণু এসেছিল জেল গেটে আমার ভাগ্নে মনির সাথে দেখা করতে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি নূরে-আলম আমার কাছে ২০ নম্বর সেলে থাকে, কয়েকটা ফুল নিয়ে আমার ঘরে এসে উপস্থিত। আমাকে বললো, এই আমার উপহার, আপনার জন্মদিনে। আমি ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করলাম। তারপর চিত্তরঞ্জন সুতার একটা রক্ত গোলাপ এবং বাবু সুধাংশু বিমল দত্তও একটি সাদা গোলাপ এবং ডিপিআর বন্দি এমদাদুল্লা সাহেব একটা লাল ডালিয়া আমাকে উপহার দিলেন।

আমি থাকি দেওয়ানি ওয়ার্ডে আর এরা থাকেন পুরানো ২০ নম্বর সেলে। মাঝে মাঝে দেখা হয় আমি যখন বেড়াই আর তারা যখন হাঁটা-চলা করেন স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য।

খবরের কাগজ পড়া শেষ করতে করতে চারটা বেজে গেল। ২৬ নম্বর সেলে থাকেন সন্তোষবাবু, ফরিদপুরে বাড়ি। ইংরেজ আমলে বিপ্লবী দলে ছিলেন, বহুদিন জেলে ছিলেন। এবারে মার্শাল ল' জারি হওয়ার পরে জেলে এসেছেন ৮ বছর হয়ে গেছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পরে প্রায় ১৭ বছর জেল খেটে ছিলেন। শুধু আওয়ামী লীগের ক্ষমতার সময় মুক্তি পেয়েছিলেন। জেল হাসপাতালে প্রায়ই আসেন, আমার সাথে পরিচয় পূর্বে ছিল না। তবে এক জেলে বহুদিন রয়েছি। আমাকে তো জেলে একলাই রাখে। আমার কাছে কোনো রাজবন্দিকে দেওয়া হয় না। কারণ তাদের ভয় আমি 'খারাপ' করে ফেলবো, নতুবা আমাকে 'খারাপ' করে ফেলবে। আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, ২৬ নম্বর সেলে যাবেন। দরজা থেকে আমার কাছে বিদায় নিতে চান। আমি একটু এগিয়ে আদাব করলাম। তখন সাড়ে চারটা বেজে গিয়েছে, বুঝলাম আজ বোধহয় রেণু ও ছেলেমেয়েরা দেখা করার অনুমতি পায় নাই। পাঁচটাও বেজে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে জমাদার সাহেব বললেন, চলুন আপনার বেগম সাহেবা ও ছেলেমেয়েরা এসেছে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে রওনা করলাম জেলগেটের দিকে। ছোট মেয়েটা আর আড়াই বৎসরের ছেলে রাসেল ফুলের মালা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। মালাটা নিয়ে রাসেলকে পরাইয়া দিলাম। সে কিছুতেই পড়বে না, আমার গলায় দিয়ে দিল। ওকে নিয়ে ঢুকলাম রুমে। ছেলেমেয়েদের চুমা দিলাম। দেখি সিটি আওয়ামী লীগ একটা বিরাট কেক পাঠিয়ে দিয়েছে। রাসেলকে দিয়েই কাটালাম, আমিও হাত দিলাম। জেল গেটের সকলকে কিছু কিছু দেওয়া হলো। কিছুটা আমার ভাগ্নে মনিকে পাঠাতে বলে দিলাম জেলগেট থেকে। ওর সাথে তো আমার দেখা হবে না, এক জেলে থেকেও।

আর একটা কেক পাঠাইয়াছে বদরুন, কেকটার ওপর লিখেছে 'মুজিব ভাইয়ের জন্মদিনে'। বদরুন আমার স্ত্রীর মারফতে পাঠাইয়াছে এই কেকটা। নিজে তো দেখা করতে পারল না, আর অনুমতিও পাবে না। শুধু মনে মনে বললাম, 'তোমার স্নেহের উপহার আমি ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করলাম। জীবনে তোমাকে ভুলতে পারব না। 'আমার ছেলেমেয়েরা বদরুনকে ফুফু বলে ডাকে। তাই বাচ্চাদের বললাম, 'তোমাদের ফুফুকে আমার আদর ও ধন্যবাদ জানাইও।'

ছয়টা বেজে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি রেণুকে ও ছেলেমেয়েদের বিদায় দিতে হলো। রাসেল বুঝতে আরম্ভ করেছে, এখন আর আমাকে নিয়ে যেতে চায় না। আমার ছোট মেয়েটা খুব ব্যথা পায় আমাকে ছেড়ে যেতে, ওর মুখ দেখে বুঝতে পারি। ব্যথা আমিও পাই, কিন্তু উপায় নাই। রেণুও বড় চাপা, মুখে কিছুই প্রকাশ করে না। ফিরে এলাম আমার আস্তানায়। ঘরে ঢুকলাম, তালা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে। ভোরবেলা খুলবে।"

এভাবেই কাটত বঙ্গবন্ধুর কারাগারের দিনগুলো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে আজ চার দশক। তাঁকে হারানোর শোক আজ ও কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাঙালি জাতি। ইতিহাসের মহানায়ক, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু এদেশের স্বাধীনতার স্থপতিই ছিলেন না, প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামেই তাঁর ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। এই মহানায়কের জন্ম না হলে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত না। কূটনীতি ও রাষ্ট্রাচারের ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুর বিশাল ব্যক্তিত্ব ও সহনশীল আচরণ পরিলক্ষিত হয়েছে।

রাসনুন মেহনাজ
মেরিটাইম ল' অ্যান্ড পলিসি বিভাগ

শিশুর জন্য, সংগ্রামী মহানায়ক

তারিক রোবন

খোকা!!

আমাদের অতি পরিচিত এক মহান মানবের ডাকনাম।

এই মানুষটি হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মা সায়েরা খাতুন। বাবা আদর করে শেখ মুজিবের ডাকনাম রেখেছিলেন খোকা।

ছোটবেলা থেকেই দুঃখী মানুষের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু। তিনি ছিলেন মানবিক, সৎ ও বন্ধুবৎসল। ১৯২৭ সালে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর পড়েছেন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল ও গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে। মিশন স্কুলে পড়ার সময় একবার সে স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সে সময়ে স্কুলের ছাদ সংস্কারের দাবি জানানোর জন্য বঙ্গবন্ধু একটি দল তৈরি করেন ও তার নেতৃত্ব দেন। স্কুলের বাইরেও অনেক বন্ধু ছিল তাঁর। গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে সবসময় দাঁড়াতেন শেখ মুজিব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ছোট-বড় সবার প্রিয়। কারণ তিনি সবাইকে ভালোবাসতেন। খুব সহজে সবাইকে আপন করে নিতেন। মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল গভীর মমতা। বিশেষ করে ছোটদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। স্নেহ করতেন। শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। আর এ জন্যই তাঁর জন্মদিন ১৭ মার্চ পালন করা হয় জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুব দয়ালু। তিনি দেখলেন, কোনো ছেলে ভীষণ গরিব, টাকার অভাবে ছাতা কিনতে পারে না, রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট পাচ্ছে, অমনি তাঁর ছাতাটা দিয়ে দিতেন। কিংবা টাকার অভাবে কোনো ছেলে বইপত্র কিনতে পারছে না, দিয়ে দিলেন নিজের বইপত্র। এমনকি একদিন নাকি এক ছেলেকে ছেঁড়া কাপড় পরে থাকতে দেখে নিজের পরনের কাপড় খুলে দিয়েছিলেন তিনি।

ছোট থেকেই এমন জনদরদি ছিলেন শেখ মুজিব।

দেশে ও জনগণের বিভিন্ন কাজে বঙ্গবন্ধু যখন গ্রামেগঞ্জে যেতেন, তখন চলার পথে শিশুদের দেখলে গাড়ি থামিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করতেন। দুস্থ ও গরিব শিশুদের দেখলে কাছে টানতেন। কখনও কখনও নিজের গাড়িতে উঠিয়ে অফিসে বা নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। নানান উপহার দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আইয়ুব খান জোর করে শেখ মুজিবসহ বহু নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখেন। পাঁচ বছরের জন্য পুরো দেশে রাজনীতি বন্ধ করে দিলে শেখ মুজিবুর রহমান তরুণদের এক যুগান্তকারী নির্দেশ দেন। বললেন, "এই পাঁচ বছর তোমরা শিশু সংগঠন কচি-কাঁচার মেলার মাধ্যমে কাজ করো। নিজেদের সচল রাখো।"

বঙ্গবন্ধু জানতেন, কচি-কাঁচার মেলা প্রগতিশীল একটি শিশু সংগঠন। শিক্ষা, সংস্কৃতি চর্চা, খেলাধুলার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, দেশ ও মানুষকে ভালোবাসার মানসিকতা বিকাশে শিশুরা সেখানে নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠার প্রেরণা পাচ্ছে। শিশুরা দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময়ে কচি-কাঁচার মেলা, খেলাঘরসহ অন্যান্য সংগঠনের শিশুবন্ধুদের অনুষ্ঠান ও সমাবেশে গিয়েছেন। শিশুদের উপস্থাপনা দেখে অভিভূত হয়েছেন, প্রশংসা করেছেন। তিনি এত সহজে, আন্তরিকভাবে শিশুদের সঙ্গে মিশে যেতেন যে, শিশুরাও তাঁকে খুব কম সময়ের মধ্যেই আপন করে নিত।

১৯৬৩ সালে তিনি শিশুদের টানে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে কচি-কাঁচার মেলা আয়োজিত শিশু আনন্দমেলায় এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, এই পবিত্র শিশুদের সঙ্গে মিশে মনটাকে একটু হালকা করার জন্য। শিশুদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এই বক্তব্যে।

১৯৭২ সালে একদিন কচি-কাঁচার মেলার কিছু ক্ষুদে বন্ধুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবি নিয়ে যাওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন গণভবনে। বঙ্গবন্ধু খুব খুশি হলেন ক্ষুদে শিল্পীবন্ধুদের কাছ থেকে

উপহার পেয়ে। তিনি তাদের হাসিমুখে আদর করলেন। তিনি আগ্রহভরে বাচ্চাদের আঁকা ছবিগুলো দেখছিলেন আর মন খুলে ছবি ও ছবির আঁকিয়েদের প্রশংসা করছিলেন।

তিনি মুগ্ধ হয়ে বললেন, "আমার দেশের শিশুরা এমন নিখুঁত ছবি আঁকতে পারে, এসব না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।"

ছবিগুলো বঙ্গবন্ধু রাশিয়া সফরের সময় সে দেশের শিশুদের জন্য নিয়ে যান শুভেচ্ছা-উপহার হিসেবে।

তিনি শিশুদের সঙ্গে সেদিন প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা কাটান এবং রাতে সঙ্গে খাবার পরিবেশন করেন। সে দিন বঙ্গবন্ধুর ঘর থেকে শিশুরা বেরিয়ে আসার সময় তিনি গভীর তৃপ্তিভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, "আজকের কর্মব্যস্ত সারাটা দিনের মধ্যে এই একটুখানি সময়ের জন্য আমি শান্তি পেলাম।"

একদিন সকালে বঙ্গবন্ধু হাঁটতে বেরিয়েছেন, যেমনটি রোজ বের হন। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু দেখলেন–একটি বাচ্চা ছেলে তার কাঁধে বইয়ের ব্যাগ ঝোলানো। ছেলেটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

বঙ্গবন্ধু ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন। জানতে চাইলেন কেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে? বঙ্গবন্ধু ছেলেটির পায়ের জুতা খুলে দেখেন জুতার ভেতর লোহার সুচালো মাথা বের হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু তখনই ছেলেটির চিকিৎসার জন্য তাঁর দেহরক্ষী পুলিশকে নির্দেশ দিলেন এবং কিছু টাকাও দিলেন। পরম মমতায় ছেলেটিকে আদর করে বিদায় দিলেন।

বঙ্গবন্ধু শিশুদের কল্যাণে ১৯৭৪ সালের ২২ জুন জাতীয় শিশু আইন (চিলড্রেন অ্যাক্ট) জারি করেন। এই আইনের মাধ্যমে শিশুদের নাম ও জাতীয়তার অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

শিশুদের প্রতি সব ধরনের অবহেলা, শোষণ, নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন, খারাপ কাজে লাগানো ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন–

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

শিশুরা যেন সৃজনশীল, মননশীল এবং মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে, তিনি সব সময় সেটাই চাইতেন।

অহিংসা দিয়ে, মানবপ্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে সমাজে যে আদর্শ বঙ্গবন্ধু নির্মাণ করে গেছেন তার মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই।

যদিও বাস্তবে গুটি কয়েকজন ছাড়া সবাই সেটা চর্চা করে বলে আমার মনে হয় না!!

আসুন না, আমরা সকলে মিলে সুন্দর সমাজ গঠনে ধর্মকে সামনে রেখে জাতির পিতাকে অনুসরণ করি।

তারিক রোবন
ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

বঙ্গবন্ধু ও বর্তমান

কাজী গোলাম দস্তগীর আহাদ

সকল পাঠককে মুজিববর্ষের এই মহান ক্ষণে আন্তরিক শুভেচ্ছার মাধ্যমে স্বাগত জানাই। না আজকের লেখাটি কোনো ইতিহাসের চর্চা কিংবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের কোনো ঘটনা নয়। আজকে খুবই সাধারণ ও তুচ্ছ একটি বিষয় সকলের মাঝে তুলে ধরব এবং বুঝতে চেষ্টা করব এর প্রভাব কতটা ব্যাপক। জাতির জনকের জন্মের ১০০ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, তবুও মানুষের মনে আজও তিনি কতটা দাপটের সাথে বিদ্যমান। তাই আজকের লেখায় তাঁর মহান কীর্তিগুলোকে ক্ষণিকের জন্য পাশে রেখে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি যে এই সকল কিছুর মূল কেন্দ্রবিন্দুটি কী ছিল? উত্তরটি নির্দ্বিধায় বলতে গেলে একটি শব্দ প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে–দেশপ্রেম। মাত্র চারটি বর্ণের একটি শব্দ, কিন্তু এর ক্ষমতা অসীম। কেবলমাত্র দেশপ্রেমের মতো একটি গুণ মানুষকে আপদমস্তক পরিবর্তন করে জন্ম দিতে পারে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত একজন মানুষকে। যার প্রতিফলন আমরা আজ আমাদের চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেমের তুলনা পৃথিবীর আর কারও সাথে তুলনার যোগ্য নয়। একইসাথে তাঁর মতো দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি আর কারও ভেতর দেখা যাবে কিনা তাও এক বিরাট সন্দেহের বিষয়। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের সকল মায়া ত্যাগ করে, সব চাহিদাকে পেছনে ফেলে নিজেকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন। এই মহান কাজটির মাধ্যমে তিনি বাঙালির মনে দেশপ্রেমের মন্ত্রে পরিপূর্ণ একটি বীজ বপন করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রতিবছরের মতো এই বছরও তাঁর শততম জন্মদিনে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আজ বাঙালি জাতি ২০২০ সালে যত বিপথগামী হোক বা যতটা উন্নতির শিখরেই যাক না কেন, তাদের মনে রয়েছে একটি সুপ্ত ঘর। যে ঘর দেশপ্রেমের আলোয় আলোকিত। বাঙালি আজ যতই পরিবর্তিত বা তথাকথিত আধুনিক হয়ে যাক না কেন, বাঙালি আজও ৭ মার্চ ভাষণে নিজেদেরকে যুদ্ধের ময়দানে অনুভব করে উত্তেজনায় তাদের শরীর কেঁপে ওঠে। ৬ বছরের শিশু কিংবা ৬০ বছরের প্রবীণ কেউই যেন বাঁধা মানতে চায় না–ছুটে যেতে চায় যুদ্ধের ময়দানে। দেশকে করতে চায় মুক্ত, পাশে দাঁড়াতে চায়। মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিষয়টা শুনতে খুব সাধারণ মনে হতে পারে। তবে এমন জাতি বিশ্বে দুটি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শুধু দেশপ্রেমকে পুঁজি করেই বাঙালিরা অনেক অসাধ্য সাধন করেছে ও করে চলছে।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এই মহান নেতা আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে তাঁর সুযোগ্য কন্যা এখনও দেশকে একই গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিচ্ছবি। মুজিববর্ষের মহান ক্ষণে প্রত্যাশা কেবল একটাই–বাঙালি যেন কখনও দেশপ্রেমের বীজটি হারিয়ে না ফেলে এবং যুগের পর যুগ এর পরিচর্যা করে। আর যখনই দেশে কোনো কালো ছায়া নেমে আসে তখনই একই সাথে বেজে ওঠে–

“এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম দেশকে স্বাধীন করার সংগ্রাম।”

জয় বাংলা

কাজী গোলাম দস্তগীর আহাদ
পোর্ট অ্যান্ড শিপিং ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

এক মুজিব ও বাংলাদেশ

মেহযাবীন নূর মিসো

বাংলাদেশ!!! কিছু হার না মানা সৈনিক ও তাদের এক তেজস্বী নেতার দেশ। সুজলা সুফলা শান্তিপ্রিয় একটি দেশ। কিন্তু এই শান্তিপ্রিয় দেশ তৈরি করতে রক্ত ঝরেছে ৩০ লাখ শহীদের এবং ২ লাখ মা-বোন তাদের সম্মান হারিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই দেশ একটি নতুন পরিচিতি লাভ করে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। বিশ্ববাসী বাংলাদেশ নামক এক নতুন দেশকে চেনে, মানচিত্রের সার্বভৌমত্ব লাভ করে। কিন্তু এই চেনানোর পথ মোটেই সহজ ছিল না।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জে এক ছোট্ট শিশু জন্ম নেয়, নাম তার শেখ মুজিবুর রহমান। ছাত্রজীবনে পদার্পণ করেন ছাত্র রাজনীতিতে-চোখ ভরা স্বপ্ন ও বুক ভরা আশা নিয়ে, দেশে তখন পাকবাহিনী জেঁকে বসেছে আমাদের মাতৃভূমিকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তখন হাল ধরেন শেখ মুজিব। লক্ষ্য একটাই, যে করেই হোক মাতৃভূমিকে পাকবাহিনীর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হবে।

জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি পার করেছেন জেলে, মানবেতর জীবনের মাধ্যমে তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে বারবার হার মেনেছে পাকিস্তানি বাহিনী। বারবার কারাবন্দি হওয়ার পরও হার স্বীকার করেননি। তিনি জেলে গেছেন ঠিকই কিন্তু বাইরে রেখে গেছে হাজারো শেখ মুজিব, যারা তার এক কথায় জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত। পাক হানাদারদের সাধ্য কি! যেখানে তারা এক শেখ মুজিবকে দমাতে পারে নাই সেখানে তাদের হাজার হাজার শেখ মুজিবকে দমানোটা অসম্ভব।

রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের কালজয়ী ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দেন। বাংলার মানুষকে তিনি তৈরি থাকতে বলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো। তবুও এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্।"

তাঁর এ ডাকের জন্যই হয়তো বাংলার দামাল ছেলেরা অপেক্ষা করছিল। তাঁর এ ভাষণের পরপরই বাংলার সূর্য সন্তানেরা পুরো শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। এদেশের মুক্তিবাহিনীর হয়তো প্রচুর অস্ত্র ছিল না। কিন্তু তাঁদের ছিল অসম্ভব মনোবল আর ইচ্ছাশক্তি।

একের পর এক আক্রমণে আস্তে আস্তে দেশের প্রত্যেকটা জেলা নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। মাত্র ৯ মাসের মধ্যেই তথাকথিত শক্তিশালী পাকবাহিনীকে বেকায়দায় ফেলে দেয়।

শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আসে। বাংলাদেশে নতুন সূর্য উদিত হয়। আর এ সূর্য ওঠানোর পেছনে ছিল অনেক হার না মানা সৈনিক এবং একজন নেতার পুরো জীবন। মুজিব কোনোভাবেই হার মানতে নারাজ ছিলেন। দেশকে তিনি মা বলে গণ্য করেছেন সবসময়, কিন্তু যে দেশের জন্য তিনি তাঁর পুরো জীবন উৎসর্গ করলেন সেই দেশের কতিপয় স্বার্থপর রাজাকার তাঁর ঘোর বিরোধিতা করে, যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে মেরামত করার কাজ করছেন, ঠিক তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হত্যা করা হয় তাঁর পুরো পরিবারকে। এমনকি এই নির্মম মানুষরূপী অমানুষগুলো ১০ বছর বয়সি রাসেলকেও ছেড়ে দেয়নি। তোফায়েল আহমেদ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেন। সেই থেকে তাঁর নতুন পরিচয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামের অর্থ যথার্থই ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই বঙ্গের বন্ধু।

শেখ মুজিবের ছিল একটাই স্বপ্ন, মা তুল্য মাতৃভূমিকে পৌঁছে দিতে হবে এক অনন্য মাত্রায়। এখন অন্যান্য অনেক দেশ বাংলাদেশকে চেনে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ নামে।

আজ হয়তো মুজিব নেই, কিন্তু রেখে গেছেন এক নতুন বাংলাদেশ। এদেশ তাঁর দেখানো পথে এগিয়ে চলেছে এবং রেখে গেছেন হাজারো মুজিব, যারা তাদের নেতার গড়া পুরো বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে।

এ যেন এক মুজিব ও এক নতুন বাংলার গল্প যে বাংলার আনাচেকানাচে আছে শেখ মুজিবের স্মৃতি, তাঁর নির্দেশনা, যতদিন পদ্মা-মেঘনা আছে ততদিন শেখ মুজিব বেঁচে থাকবেন। তিনি অমর হয়ে বেঁচে থাকবেন বাংলার আকাশে, বাতাসে।

মেহযাবীন নূর মিসো
মেরিটাইম ল' অ্যান্ড পলিসি বিভাগ

তরুণ প্রজন্মের চেতনায় মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

মুক্তিযুদ্ধের ছোট গল্প

সাইফ খান সানি

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, তাই মুক্তিযুদ্ধের জন্য আমার কোনো গল্প নেই। মুক্তিযুদ্ধের গল্প মুক্তিযোদ্ধোরাই ভালো বলতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, আজ আমি দুইজন মুক্তিযোদ্ধার গল্প বলবো। যাকে নিয়ে এই লেখা তাঁর নাম আব্দুল লতিফ, মুক্তিযোদ্ধা আবদুল লতিফ। তৎকালীন সময়ে তিনি পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে নোয়াখালীতে কর্মরত ছিলেন। যদিও তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তবে তিনি যে কাজটি করেছেন তা হলো, ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রতি সপ্তাহে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে আসতেন। সেখানেই তার পৈত্রিক নিবাস ছিল। সেখানে এসে তিনি খোঁজ করতেন ডাকবাক্সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আসছে কিনা বা রাজাকারদের কোনো চিঠি কোথাও যাচ্ছে কিনা। তাঁর ভাই ছিলেন সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা। আব্দুল লতিফের কাজকর্ম রাজাকারেরা জানতে পারে এবং সেই মোতাবেক তারা পাকিস্তানি মিলিটারিদের তথ্য দেয়। একদিন মিলিটারিরা বাড়িতে হানা দেয়। সাব-ইন্সপেক্টর সেইদিন তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে বাড়ির পাশের আঙিনায় হাঁটাহাঁটি করছিলেন। যে ভাই সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাঁকে পুলিশ কর্মকর্তা ভেবে হত্যা করা হয় এবং ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি সেদিন বেঁচে যান। লতিফ সাহেবের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর স্বামী পুলিশে চাকরি করেন কিনা? মিথ্যা বলে স্বামীর জীবন তিনি বাঁচিয়েছিলেন। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সাইফ খান সানি
ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

বুক পকেটের চিঠি

মো. আরমান হোসেন

৩ নভেম্বর ১৯৭১

শ্রদ্ধাভাজনীয়া মা,

প্রথম আমার সালাম নিবেন। আপনার মানসিক স্থিরতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করবো না, কারণ আমি জানি নিজের ছেলেকে যুদ্ধের ময়দানে রেখে কোনো মা-ই মানসিক স্বস্তি পায় না। তবে আপনি আমার জন্য কান্না করে বুক ভাসাবেন না–এই অনুরোধই করবো। আর যদি কান্না করতেই হয় তবে নামাজে সিজদায় শুধু আমি নই, আমার মতো লাখো সন্তানতুল্য মুক্তিযোদ্ধার জন্য দোয়া করবেন। আজকে আমার এই কয়েক মাসের মুক্তিযোদ্ধা জীবনের সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখবো বা বলতে পারেন আপনার সাথে গল্প করবো।

যেদিন আপনার চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসি, সেদিন ছিল সোমবার। রাত খুব বেশি না, আবার উপজেলা শহর হিসেবে একেবারে কমও হবে না। মনে হচ্ছিল আমার কলিজার বেশ বড় একটা অংশ কেটে বোধ হয় ঘরে ফেলে এসেছি। যখন আমাদের পশ্চিম পাড়ার আনিসের সাথে ইলিয়টগঞ্জের ক্যাম্পটাতে পৌঁছাই তখন ভোর হচ্ছে। সকালে আমরা দুজনসহ আরও ১২ জন রওনা হলাম কুমিল্লা-ত্রিপুরা বর্ডারের দিকে। তখন আমাদের ইলিয়টগঞ্জ ক্যাম্পের কমান্ডার মোতাহের ভাই সতর্ক হয়ে যেতে বললেন কেননা আমাদের যাত্রাপথে কুমিল্লা সেনানিবাস পার হতে হবে। দুইদিন পর পৌঁছালাম কুমিল্লা-ত্রিপুরা বর্ডার এলাকায় যেখানে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। সেখানে মোট ১৪ দিন প্রশিক্ষণ নিয়ে যখন যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাথমিক জ্ঞান কোনোমতে মাথায় এঁটেছি, ঠিক তখনই আমাদের সাতজনের একটি দলকে পাঠানো হয় ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আনিস বেশ অসুস্থ হয়ে পরে, যার দরুন তাকে আমাদের সাথে পাঠানো সম্ভব হয়নি। তিনদিন পর যখন যাত্রাবাড়ি পৌঁছাই তখন আমাদের সঙ্গে আছে অতি নগণ্য কিছু অস্ত্র যা পাকি সৈন্যদের কাছে খেলনাসম। তবুও ইস্পাতদৃঢ় মনোবলই ছিল আমাদের সাতজনের মূল শক্তি। আমরা আরও দুইদিন সময় নিই নিজেদেরকে একটু প্রস্তুত করে নিতে আর একটি নিরেট পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে। পরিকল্পনামাফিক রাত ৯:৩০টায় আমাদের আক্রমণ করার কথা, কেননা ইতিমধ্যেই ঢাকার পাকি সৈন্যরা বিচ্ছুদের ভয়ে আঁটসাঁট হয়ে আছে। তাই তারা দিনে তাদের ক্যাম্পের আশেপাশে নিরাপত্তা জোরদার করেছে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাদের আন্দাজে গুলি ছোড়া ছাড়া কিছুই করার থাকছে না। জানো মা, মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দল আছে যার নাম 'ক্র্যাক প্লাটুন' দেশের মানুষ তাদেরকেই বিচ্ছু বলে ডাকে। সেদিন রাতের পরিকল্পনাতে আমি আর হাসান ভাই প্রথমে সায়েদাবাদের পাকিস্তানি সৈন্যদের বাঙ্কারের পেছনে দুটি স্টেনগান ও কয়েক রাউন্ড বুলেট নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ শুরু করি। আপনি হয়তো ভাবছেন, যেই হাতে আমি কখনও নারিকেল ছিলে দিতে পারিনি, সেই হাত দিয়ে কীভাবে স্টেনগান চালাতে পারলাম? কিন্তু আমার হাত একটুও কাঁপেনি; বরং তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ভেসে ওঠা খাদিজা আপুর বয়সি একজন মেয়ের বস্ত্রহীন লাশ, চোখে ভেসে উঠেছিল মায়ের লাশের পাশে এক নিষ্পাপ শিশুর মাথা থেকে মস্তিষ্ক বের হয়ে আসা লাশ। এই সকল দৃশ্যই আমার হাতকে মেশিনের মতো চালাতে পাগলপ্রায় করে দিল। এরপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ হলো। যখন পাকিস্তানিদের বাঙ্কারকে একদম শ্মশানে পরিণত করেছি, তখন রাত ২:১৫ বাজে। একটা সফল অপারেশন হলেও আমার ডান হাতের কনুইয়ের দিকে একটা গুলি লেগেছে, আর হাসান ভাইয়ের ডান পায়ের উরুতে গুলি লেগেছে। এরপর চারদিন ঢাকায় হাসান ভাইয়ের এক আত্মীয়ের বাসায় আমাদের চিকিৎসা করা হয়। কোনোমতে আমাদের ক্যাম্পে যখন পৌঁছাই গিয়ে দেখি তার চারদিন আগের এক অপারেশনে আনিসের ঠিক চোখের নিচে আর গালে গুলি লাগে। একরাত অনেক কষ্টে বেঁচে থাকলেও এর বেশি আর বাঁচতে পারেনি। দুদিন প্রায় নির্বাক ছিলাম। এর মাঝে একদিন হঠাৎ করেই আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে হলো আর তখন আমি আবার ইলিয়টগঞ্জের একটি অপারেশনে। লিডার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছি। রাতের একফাঁকে আপনাকে আর আপুকে দেখতে বাড়িতে গেলাম। কিন্তু আপনাদের দেখা আর পেলাম না। আপনাদের না পেয়ে আধঘণ্টার মতো আপনার বিছানায় শুয়েছিলাম। তারপর চলে আসি।

আপনাদেরকে না দেখে অনেক অযাচিত যন্ত্র সব ভয়ংকর দৃশ্য আমার মনে উঁকি দিলেও শেষ পর্যন্ত কোনোটাই পাত্তা পায়নি। আপনারা হয়তো কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গিয়েছেন–এই কথাকেই মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে এই

চিঠিটা লিখছি। জানি না কখনও আপনার কাছে পৌঁছাবে কিনা, তবে এই চিঠিটা যখন লিখছি, তখন মনে হচ্ছে আপনি আমার প্রতিটা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, আর আমি এক অবর্ণনীয় শান্তিতে ডুবে যাচ্ছি। আগামীকাল সন্ধ্যায় আমাদের অপারেশন দোয়া করবেন যেন সফল হই। তবে জানি না বেঁচে ফিরতে পারব কিনা, কিন্তু রক্ত যতদিন এই শরীরে বইবে ততদিন লড়ে যাবো, এই দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য। জানি না এরপরে আর কখনও আপনাকে চিঠি লেখার সুযোগ হবে কিনা? শহীদ বা গাজী যাই হই না কেন, বিজয়ের দিনে আমার কথা মনে করে একটু হলেও হাসবেন, এই ইচ্ছা পোষণ করেই শেষ করছি।

ইতি

আপনার নাড়ীছেড়া পুত্র
আলাউদ্দিন

পুনশ্চ: ৫ নভেম্বর ১৯৭১ সালে আলাউদ্দিন নামের এক বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃতদেহের বুক-পকেটে এই চিঠিটা পাওয়া যায়। চিঠিটার কিয়দাংশ রক্ত লেগে লাল হয়ে গিয়েছিল, তখন চিঠির সেই সাদা কাগজটাকে কেন যেন সবুজ বলে কল্পনা করতেই বেশি ভালো লাগছিল, ভালো লাগছিল এই ভেবে যেন সবুজ বাংলার বুকে এক টুকরো লাল সূর্য জায়গা করে নিয়েছে।

মো. আরমান হোসেন
ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

মুক্তিযুদ্ধের একটি বাস্তব চিত্র

ইহসানুল হক

আমি আব্বুকে একদিন বললাম, আব্বু আপনি তো মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন। এ সম্পর্কে আপনার চোখে দেখা কিছু ঘটনা বললে আমি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতাম ও খুবই আনন্দিত হতাম। তখন আব্বু আমাকে বললেন, "তাহলে আমার চোখে দেখা কিছু ঘটনা তোমাকে শোনাচ্ছি।"

১৯৭১ সাল। ডিসেম্বর মাস। তখন আমার বয়স সম্ভবত ৬/৭ বছর। একদিন ভোর রাতে আমাদের বাড়ির রাস্তা দিয়ে বহু লোক যাচ্ছিল। বুট জুতোর থমথমে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তখন আজান হচ্ছিল। আম্মা ফিস্ ফিস্ করে বললেন, কথা বলিস না। মনে হয় পাক হানাদার বাহিনীরা আসছে। আসলে ছিল মুক্তিবাহিনী। হাজার হাজার মুক্তিসেনা। তাঁদের মাঝে রয়েছেন প্রচুর ভারতীয় সৈন্য। ভারতের মিত্র বাহিনীর সদস্যরা ম্যাপ দেখে জামালপুর সদর থানার কোচগড় মৌজা খুঁজছেন। আসলে বিনন্দের পাড়াটা হলো কোচগড় মৌজার ভেতরে। আব্বু ও চাচারা তাঁদেরকে বললেন বিনন্দের পাড়াটা হলো কোচগড় মৌজার আওতাভুক্ত। এটা ছিল জামালপুর থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে, ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কের পাশে। তাঁরা খুব দ্রুত বাঙ্কার খনন করে ফেললেন। মিত্রবাহিনীর সাথে ছিল হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের সাথে ছিল পাশের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুজি মামা। তিনিসহ আরও বেশ কয়েকজন গ্রাম থেকে সৈন্যদের সকালের খাবারের জন্য চাল, ডাল, ডিম, মুরগি সংগ্রহ করতে এলেন। গ্রামবাসী সবাই মিলে সামর্থ অনুযায়ী তড়িঘড়ি করে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমি ও আমার সমবয়সি ছোট চাচা তাঁদেরকে দেখতে গেলাম। আমি সৈন্যদের পোশাক দেখে খুবই আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলাম। আব্বা বললেন, "ওরা মুক্তিবাহিনী। ওরা দেশেকে শত্রুমুক্ত করবে। বাবা ভয় পেও না।" তখন আমার মনে খুব ফুর্তি লাগছিল। মুজি মামা সকালে একটি মেশিনগান এনে মহিলাদের দেখালেন কীভাবে গুলি করতে হয়। আম্মার সাথে থেকে আমি তা দেখেছি। এদিকে মুজি মামা সবাইকে গ্রামের বাইরে চলে যেতে বলছিলেন। সবাই নিজেদের মতো প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমরা তখন তিন ভাই চার বোন, বৃদ্ধ দাদা, আব্বা, আম্মা ও কাজের লোকসহ ১২ জন। আমরা সবাই দ্রুত খাওয়া শেষ ছিলাম। হঠাৎ করে গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ। মনে হচ্ছে কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে। প্রায় আধা ঘণ্টা চলল এ কানফাটানো আওয়াজ। আমি ভয়ে একেবারে কাতর। একটু পরে ঘটনা জানা গেল—কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা একটি জিপ গাড়িকে কাছাকাছি মহাসড়ক দিয়ে খুবই ধীরগতিতে আসতে দেখে ভারতের একজন সেনা দূর থেকে ট্র্যাফিকের মতো সিগন্যাল দিচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনারা জিপ থেকে দ্রুত নেমে গাড়ির পেছনে গিয়েই ওই সৈন্যকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। শিখ সৈন্য সাথে সাথে মারা যায়। তখন মিত্রবাহিনীর সদস্যরা বৃষ্টির মতো অনবরত গুলি করতে থাকে। এতে দুজন পাকিস্তানি সেনা মারা যায়। বাকিরা পালিয়ে যায়। জিপের ধ্বংসাবশেষ রাস্তায় পড়ে থাকে।

এই ঘটনার পরে আমরা গরু, বাছুর, কাঁথা, বালিশ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে পাশের পিংগলহাটি গ্রামের ফুফুর বাড়িতে অবস্থান নিতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মুক্তিবাহিনী ও ভারতের মিত্রবাহিনীতে ভরপুর। কারণ ৫/৬ গ্রাম জুড়ে মুক্তিবাহিনীরা অবস্থান নিয়েছিল। যাতে কিনা পাকিস্তানি সেনারা জামালপুর শহর ছেড়ে যেতে না পারে। সেখানে শিখ সৈন্যরা চেয়ারে বসে চুল ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেন। আমি চুল আর পোশাক দেখে আবার ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আব্বা সিদ্ধান্ত নিলেন, পাশের গ্রাম শাহ্বাজপুরে খালাম্মাদের বাড়িতে যাবেন। পোঁটলা, গরু, বাছুর সহ সবাই কান্না করতে করতে রওনা হলাম। ওখানে গিয়ে ৪/৫ দিন ছিলাম। ভারতের বিমান নিয়মিত বিরতিতে শহরে বোমা ফেলছিল। এত বিকট আওয়াজ হতো ভয়ে আমরা কানে আঙুল দিয়ে কতবার যে মাটিতে শুয়ে পড়েছি তার হিসাব নেই। হঠাৎ করে খবর এলো যে পাকিস্তানি সেনা আসছে। সবার মুখে হাউ মাউ কান্না কাটি। সবাই দৌড়ে সামনে চলছে। আমরা গরু বাছুর রেখেই চিৎকার করতে করতে হাতের কাছে দুই একটা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে রওনা হলাম আব্বার নির্দেশ মোতাবেক নানার বাড়ি রনরামপুরের দিকে। সবাই দৌড়াচ্ছে। আমরা অল্প কিছু পথ অতিক্রম করি। হঠাৎ করে আমি আব্বাকে বললাম, তাড়াহুরোয় দাদাকে তো আনা হয়নি। আব্বা হঠাৎ দিশেহারা হয়ে গেলেন। আমি ও আব্বা দ্রুত গিয়ে অসুস্থ দাদাকে বৈঠকঘর থেকে ঘুম থেকে তুলে যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে নানা বাড়ির দিকে রওনা হলাম ও গিয়ে পৌছালাম। অসুস্থ দাদা করুণ স্বরে বললেন, আমাকে সবাই ভুলে গিয়েছিল, কেবলমাত্র আ. হাকিম (আমি) আমাকে ভুলেনি। নাহলে পাকিস্তানি সেনারা আমার মাথার খুলি উড়িয়ে ফেলত। তাই আমার (দাদার) খাটটা আমি আ. হাকিমকে দেবো। দাদা মারা যাওয়ার পরে আব্বা আমাকে সেই খাটটা সত্যি সত্যি দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ৯ মাস মহাআতঙ্কে ছিলাম। তাই নয় মাস তো বলতে গেলে ঘুমোতেই পারিনি। যখনই দাদার খাটে ঘুমাতে যেতাম, তখন সেই করুণ কাহিনি মনে পড়ত। তবে দাদার খাটে এত গভীর ঘুম হতো যে কেউ চেঁচামেচি করলেও ভাঙতো না। স্বাধীনতার পর বহুদিন আমি শহরে যাইনি। কারণ আমার ভয় হতো পাকিস্তানি সেনারা বুঝি এখনও শহরের কোথাও লুকিয়ে আছে।

ইহসানুল হক
মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার বিভাগ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

Design and Publication: Wings of Wind